অন্তর্য্যামী অমৃতময়ী শ্রীশ্রীশোভা-মা

রেণুকা গুহ

অন্তর্য্যামী
অমৃতময়ী
শ্রীশ্রীশোভা-মা

রেণুকা গুহ

দীন প্রকাশক :
শ্রীশ্রীমাতৃচরণাশ্রিত দাসানুদাস
শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল মুখোপাধ্যায়
২০০/ভি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড,
কলিকাতা-২৬

প্রথম সংস্করণ—১১০০ কপি
প্রথম প্রকাশ—মহা-অষ্টমী, ১৩৮০ সন

মূল্য : ২.৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

১। সন্ত-আশ্রম, বারাণসী
ডি/৫৩/৮৮/জি; লাক্সা
সন্ত নগর, বারাণসী।

২। সন্ত-আশ্রম, কল্যাণী,
বি, ৬/১২৫, কল্যাণী,
পোঃ—কল্যাণী, নদীয়া।

৩। ভারবি
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপাল ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ

২১-৮-৭২

"মা সোনা!

তুমি তোমার মায়ের কথা লিখ্‌তে চাও—এ তো খুবই আনন্দের কথা। চেষ্টার পিছনে তাঁর আশীর্ব্বাদ আস্‌বে।"

ওঁমা

পরমগুরু জগৎ-জননী
"শ্রীশ্রীশোভা-মা"য়ের
শ্রীশ্রীচরণ-কমলে—
শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাগো!
সুবাসিত ফুল্ল-কুসুমিত
তোমার বাণীর গুচ্ছগুলি—
নব-বরষের নবীন প্রভাতে
তোমারি চরণে দিনু অঞ্জলি।

পি ৭৮২, পি ব্লক,
নিউ আলিপুর,
কলিকাতা-৫৩
১লা বৈশাখ, ১৩৮০ সাল।

রেণুকা

'দুটি কথা'

কবি গাহিয়াছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—সিদ্ধমহাপুরুষদের জীবন ইহাই। অসীমের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারাও অসীমই হইয়া যান। সসীম মানুষ আমরা, সেই অসীমকে বুঝিতে পারি না বলিয়াই ভগবানের করুণা সিদ্ধমহাপুরুষদের জীবনের মাধ্যমে, সীমার মাঝে অসীমের খেলা—আমাদিগকে নানাভাবে প্রবুদ্ধ করেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যাঁহার কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইল লেখিকা শ্রীমতী রেণুকা গুহের মনোদর্পণে যাহা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহারই রূপায়ণ।

গ্রন্থটির বিশেষত্ব এই যে—স্বচ্ছ-দর্পণে যেমন কোন কিছুরই প্রতিবিম্ব তদনুরূপ প্রতিফলিত হয়, লেখিকার মনোদর্পণে ও "শ্রীশ্রীশোভামায়ের" আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও অন্তর্য্যামিত্ব যতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা তিনি সহজ, সরলভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে এমন একটি সারল্য রহিয়াছে যাহার সত্যতা পাঠক-পাঠিকামাত্রকেই আকর্ষণ না করিয়া পারিবে না। তাহা যে কি, বলিয়া বোঝান যাইবে না। পাঠক পাঠ করুন, বুঝিবেন, বুঝিয়া চিত্ত তৃপ্ত হইবে।

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার
(ভাইদা)

সন্ত-আশ্রমের আশ্রম-জননী—অন্তর্য্যামী অমৃতময়ী শ্রীশ্রী১০৮শোভা-মা

মাতৃ-স্মরণে—শরণাগত

মনের মাঝে কত কথাই খেলা করে যায়—কত ভাবই রঙীন হয়ে ওঠে—শুধু বসে বসে ভাবি আর ভাবি—কি ভাবে আমার পরমশ্রদ্ধেয়া শ্রীশ্রীশোভা মায়ের কথা লিখবো—নিজেই বুঝতে পারি না যে!

যাঁর আদি-অন্ত পাওয়া ভার তাঁর কথা লিখে কি কখনও শেষ করা যায়? না, তাঁর কথা লিখবার প্রচেষ্টা—শুধুই কি নিজের মনের ভাবধারাকে প্রকাশ করবার অহমিকা? অহংএর সাথে স্বয়ং যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে সব চেষ্টাই হবে বৃথা—শুধু শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে অহংএর পূর্ণ সমর্পণে তাঁরই দেওয়া ভাব-ভাষাতে নিজেকে পূর্ণ করে না নিলে!

তাই, 'মাগো'! তোমার চরণে এই প্রার্থনা—তোমার চেতনায় দাও মোরে চেতনা, তোমার সত্তায় মিলিয়ে মিশিয়ে দাও আমার সত্তা, তোমার আনন্দের সাথে মোর আনন্দ! তোমারই ভাবে ভাষায় পূর্ণ করে দাও আমারে—আমার নিজের বলে কিছুই না রেখে!

প্রতিটি শ্বাসে শ্বাসে তোমার অনুভবময় অনুভূতিতে মাতৃ-জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত কর।

এ লেখনীর মাতৃনামগান হউক তোমারি সৃজন। আমার মনে প্রাণে ও ভাবে কৃপা করে অধিষ্ঠিতা হও 'মা'।

জয় "শ্রীশ্রীমা"

'মা'

ধরণীর বুকে প্রথম প্রভাতে
তোমারে পেয়েছি নূতন আলোতে ;
বড় আপনার তুমি 'মা' আমার
পরম আশ্রয় পেয়েছি তোমার কোলেতে।
তোমার মনের ভাবনা দিয়ে গড়া
আমার এ মনের ভাবনা জানি,
তোমার স্নেহের নিগূঢ় আলোড়নে
আলোড়িত মোর নূতন জীবন খানি।
তুমি মা আমার শক্তির আধার,
কর্ম্মক্লান্ত দিনে শান্তির মাধুরিমা—
জীবনের গানে জীবনের ভুলে
তুমিই 'মা' আমার প্রাণ-প্রতিমা।
তোমারে ভালবাসিয়া আমি
সবারে বাসিবো ভাল।
তোমার স্নেহের আলোটি জ্বালিয়া
জগত করিব আলো॥—
অন্তর জুড়িয়া থাকো 'মা' তুমি
আমার সংসার জীবনে—
মনের গোপনে তোমারে পূজিব
মনের গোপন-ধ্যানে।
তোমারি নাম প্রতি শ্বাসে শ্বাসে
পড়ে যেন মোর মনে,

আলোক-ধন্যা তুমি মা জননী
আমার হৃদয়-গগনে।
প্রথমে তোমারে নমিয়া আমি
নমিব সকল জনে,
তুমি যে আমার শোভাময়ী 'মা'—
এ সুন্দর ভুবনে।

'মাতৃবন্দনা'

জগৎ-জননী 'মা' আমাদের, ব্রহ্মময়ী মা; স্নেহময়ী মা আমাদের, কৃপাময়ী মা; শুদ্ধাসনাতনী মা আমাদের, জ্যোতির্ম্ময়ী মা; কল্যাণময়ী মা আমাদের—সুহাসিনী মা; শান্তি-স্বরূপিণী মা আমাদের, সর্বতাপহারিণী মা, অন্নপূর্ণা মা আমাদের, ক্ষমাময়ী মা; সন্তানবৎসলা মা আমাদের—প্রেমময়ী মা; ভাবময়ী মা আমাদের, সর্বংসহা মা; ব্রহ্মপরাৎপরা মা আমাদের—শিশুগোপালরূপী মা; বজ্রাদপি কঠোরা মা আমাদের—কুসুম-কোমলা মা; দশপ্রহরণধারিণী মা আমাদের, শক্তিদায়িনী মা; তৃপ্তিদায়িনী মা আমাদের—আনন্দময়ী মা; চির নবীনা মা আমাদের, পথের সাথী মা!

জগৎগুরু পরমগুরু শোভার আধার
'শ্রীশ্রীশোভাময়ী মা'—
সকল সুখের একই আধার—
'মা জননী মা'।

সর্বরূপে মা, সর্বস্থানে মা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মহারূপে মহাযোগী মা। সেই মায়ের সন্তান আমরা, সবাই এসো মিলিত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে নিজেদের নিবেদন করে ধন্য হই, পূর্ণ হই!

প্রকৃতি ও পরম চেতনার মাঝে মাতৃভক্তির অনন্ত রূপের উপলব্ধি

হে ধ্যানমগ্না জ্যোতিরূপা মহাযোগিনী! নিজের আত্মায় আত্মস্থ ও সমাসীন! মহামন্ত্ররূপে উচ্চারিত তব বাণী—উৎসারিত ও উৎসর্গীকৃত—আপন হৃদয়ের অমৃত সুধাধারায় স্নাত—পরম আত্মায় আত্মার স্পন্দনে স্পন্দিত ওঙ্কার ধ্বনি—স্থলে, জলে ও মহাকাশে মহাধ্বনিরূপে ধ্বনিত ও নিনাদিত!

তব অপরূপ রূপের প্রকাশ আপন সত্তায় আপনি মহীয়ান্,—মনের গভীরে আপনার স্নেহ-স্নিগ্ধধারায় বিরাজিত, ধ্যান-গম্ভীর সুন্দর সত্তায় মাতৃত্বের মহাভাবে আপনি পরিপূর্ণ, উদ্বেলিত!

নিস্তরঙ্গ তরঙ্গের আঘাতে উদ্বুদ্ধ, মহামাতৃত্বের মহাভাবে আচ্ছন্ন চেতনা তরঙ্গরাশি তোমাতেই প্রবাহিত—সূক্ষ্ম অবচেতন মনের কন্দরে কন্দরে কানায় কানায় পরিপূর্ণ—মাতৃত্বের উজ্জ্বল সত্তায় উদ্‌যাপিত জীবনের মহাব্রত! মহানন্দে খেলাচ্ছলে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সুষমা আহরণ করে বিলিয়ে দিচ্ছ মাতৃ-স্নেহ-ধারায় আপ্লুত, আপনার ভাবে বিভোর হয়ে, বিশ্বমানবের মাঝে, অতি সূক্ষ্ম আবরণে ঢাকিয়া নিজেরে!

জীবনের প্রতিটি চলার পথের ছন্দোময় গতি তোমারই প্রাণের স্পর্শে ছন্দিত, তব পথের নির্দ্দেশ আনন্দের স্পর্শে স্পন্দিত, মাতৃস্নেহের মধুর রসে পরিপূর্ণ হৃদয় অমৃত-সাগরের জোয়ারে প্রবাহিত!

তোমার হৃদয়ের উৎসারিত তেজঃপুঞ্জের প্রবাহ তরঙ্গদোলায় হিল্লোলিত—পূর্ণশক্তির মহামিলনে মহাশক্তির প্রকাশ! প্রতিটি অণুপরমাণুতে সৃজনী-শক্তির পূর্ণ বিকাশ—অসীম মাতৃশক্তির প্রকাশ; অপরূপ লীলায় লীলায়িত, শান্ত ও সমাহিত, বিশেষ শক্তির তড়িৎ প্রভাবে প্রভাবান্বিত—প্রকাশে ও বিকাশের বিশেষ ভঙ্গিমায় আপনার অখণ্ড পূর্ণ সত্তায় আপনি প্রতিষ্ঠিতা—মহামিলনে আনন্দে বিভোর! পূর্ণ শক্তির মহাশক্তি তোমাতেই বিলীন হয়ে

খণ্ড খণ্ডরূপে একক অখণ্ড সত্তায় তোমার মহাসত্তা প্রকাশিত! সকল অন্তর মাতৃস্নেহধারায় করেছ সঞ্জীবিত—মহামিলনের মহাক্ষেত্র তব মাতৃহৃদয়-মন্দিরে!

স্তিমিত লোচনে অপার স্নেহ-করুণা, নবীন কিরণে নবরাগে উদ্ভাসিত; স্মিত আনন স্নিগ্ধ শান্তির জ্যোতির দিব্য প্রভায় মণ্ডিত। ধ্যানমগ্না ঐশ্বর্য্যময়ীরূপে তুমি কি মহাশক্তি, মহামায়া পরম মাতা জগৎ জননী, আলোক-শক্তিসম্পন্না বিন্দুবাসিনী? সকল শক্তি বিধৃত করিয়া সন্তান-স্নেহ-বিধুরা তুমি কি মোদের স্নেহময়ী জননী? তুমি কি মোদের মা, সন্তান-শোভাময়ী?

তুমি কি মাগো! আমাদের আত্মার পরমাত্মার মহামিলনে স্নিগ্ধ আলোর শিখা? পরম স্নেহভরে, পরম লীলাভরে, প্রতিটি অবচেতন সুপ্ত কল্পিত মনের পরম অভয়, পরম আত্মার সহজ সংযোগ—পরম সংশয়ের মাঝে জীবনের প্রদীপ্ত শিখা—কে তুমি?

মনের ব্যাকুল বাসনায় তুমি আত্মার পরমাত্মীয়, পরম দিব্য-চেতনা; আনন্দময় পরমাত্মায় তুমি কি মনের আবেগ, প্রাণের স্পন্দন, দেহের আকৃতি, জীবনের গতি—আনন্দের মাঝে আনন্দে স্ফুরণ, আনন্দে উদ্ভূত, আনন্দে গীত—আত্মার আত্মায় আনন্দ-চৈতন্যের স্নিগ্ধ আলো?

তুমিই কি মা জীবনকে বেঁধে দিচ্ছ একক ও অখণ্ড রূপে, আত্মার অখণ্ড বন্ধনে, পরম আলোর সত্তায়, মাতৃস্নেহের অমৃত ধারায়, শক্তির মধুবারি সিঞ্চনে? মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছো—সীমার মাঝে অসীমের পরম সত্তায়—আত্মার আত্মীয়তার বন্ধনে? জানিয়ে দিচ্ছ—তোদের মাঝেই মিলে মিশে একের মাঝে বহুর প্রকাশে যে আমি—সেই চির শাশ্বত, পরম সত্য, ধ্রুব সনাতনী পরমাগতি আমি—তোদের মা!

মাগো! তুমি জীবনের পরম দেবতা—খেলাচ্ছলে পরম আত্মীয়রূপে বিরাজমান!

ব্যাকুল হৃদয়ে, আনন্দঘন আকুল কামনায়, অসহ্য অনুভূতির মাঝে, বারে বারে ডেকেছিলাম কি তোমায় "দেখা দাও" "দেখা দাও" বলে, পরম জননী-

রূপে, পরম আত্মার শুদ্ধ সত্তার পরম আত্মীয়রূপে, আত্মার আত্মজ পূর্ণ ব্রহ্মময়ীরূপে ?

অপূর্ব্ব মনের ছন্দে, তোমার বিশ্বলীলায়, সুপ্ত মনের অন্তর-কামনায়, প্রকৃতির মাঝে দেখেছি তোমায় চন্দ্রালোকিত গগনে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত ঐশ্বর্য্যময়ীরূপে ! তোমায় দেখেছি—তমসাবৃত গাঢ় আঁধারে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে, আলোকবর্ত্তিকা হাতে ; দেখেছি তোমায় স্থির বিজলী চমকে বিদ্যুৎ প্রবাহের তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে ! বর্ষণমুখর রাতে তোমায় দেখেছি সদ্যঃস্নাতা বর্ষণ ধারার মাঝে—নীল জলদ গুরুগম্ভীর মেঘের ঘর্ষণে তোমায় হেরেছি অশনি-সঙ্কেতে ! দেখেছি তোমায় সমুদ্রের তরঙ্গমালায় সদাচঞ্চল প্রাণপ্রাচুর্য্যে উত্তাল, উদ্দাম, আনন্দময়ীরূপে—ছোট্ট শিশুর আনন্দে, মহা আনন্দে নিজের আনন্দে নিজেই পরিপূর্ণ !

জীবনের পরম লগ্নে তোমায় দেখেছি হিল্লোলিত জীবন-প্রবাহে, হাওয়ায় হাওয়ায় গানে সুরে ছন্দোময়রূপে তোমারি অনুভব—নিদ্রার মাঝে তোমার পরম প্রকাশ সুপ্তির স্বপনে—সংসারের অস্থিরতার মাঝে তোমার প্রকাশ স্থির ও অবিচল—শোকতপ্ত হৃদয়ে, মৃত্যুর মহালগ্নে, তুমিই চির সান্ত্বনা—দৃষ্টি-হীনের তুমিই দৃষ্টি—প্রদীপ্ত মনের গভীরে তুমিই ব্যাকুলতা, তুমিই চির সত্য, চির উজ্জ্বল, অনন্তে ব্যাপ্ত ব্যাপ্তিময়ী ; দিশেহারা মনের গহনে তুমিই রাতের ধ্রুবতারা—সূর্য্যের প্রখর তেজে তুমিই তেজস্বিত রূপে অনন্ত-শক্তি, জীবনের বিভীষিকার মাঝে তুমি চির আশ্রয়, চির অভয় মাতৃস্নেহ ধারায় স্নেহময়ী মা জননী !

চিনেছি তোমায়, জেনেছি তোমায়—কালের মহাকোলে তুমি আদি বিশ্বজননী, যুগযুগান্তের পরম আত্মীয়, সবাকার সমুদ্র-মন্থনে আবির্ভূতা তুমিই মা অমৃতমন্থনী মহাজননী, তুমিই মা মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, অনন্তজ্ঞানরূপী ব্রহ্ম, চিরসত্য, ব্রহ্মব্রহ্মাণ্ড, অনন্তশ্রী, পূর্ণ অনন্তময় !

মধুর মাতৃরূপে আবির্ভূ'তা তুমি মাগো প্রেমানন্দে ভক্তি-আনন্দে কল্যাণময়ীরূপে সবারই অন্তরে বিরাজ করছো, মহা আনন্দে !

তোমার সচ্চিদানন্দের আনন্দ-জোয়ার-স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাও তোমার সন্তানদের—ভরপুর করে দাও সবার হৃদয় তোমার কল্যাণময় পরশে ! পরম-লগ্ন আসে যেন তাদের জীবনে তোমারই আশীর্ব্বাদে !

শ্রীশ্রীগুরুর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা—তোমার হৃদয়ের গভীর অন্তরে ধ্যানরূপে মগ্ন ! গুরুর মহান্ মহীয়ান্ সত্ত্বা—তোমাতেই প্রবাহিত হয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে তোমার আপন সত্ত্বাতে—ধ্যান-গম্ভীর সুন্দর পরম সত্ত্বায় প্রকাশে বিকাশে পরম গুরুর নিত্য সত্ত্বায় তুমি আপনি আপনিতে বিরাজমান ! ।

তুমি যে 'মাগো' ! প্রতিটি স্পন্দিত হৃদয়ের ঈপ্সিত মনের কামনা, আত্মার আত্মায় সূক্ষ্ম-চেতনা, অবচেতন মনের অন্তরে প্রদীপ্ত দীপশিখা, প্রাণকেন্দ্রে নামের ধ্বনি, সহজ সরল হৃদয়ের পরম শান্তির পরম অভয় !

গুরুর গুরু—মহাগুরু—মাতৃগুরুরূপে আবির্ভূ'তা তোমারে জানাই আমার অন্তরের আনন্দ-প্রণাম !…

মাতৃ-অন্বেষণে—মনের ভাবধারা ও প্রার্থনা।

প্রকৃতি ও জীবনের মাঝে তোমার উপলব্ধি—দর্শন—প্রাণ ও মন একান্ত করে তোমায় পাবার বাসনা—স্থূল দেহে তোমার স্পর্শময় অনুভূতি—জননী-রূপে, মাতৃরূপে—আমায় উদ্বেলিত করে তোলে—জীবনের হতাশার মাঝে বাজে আশার স্বর! তাইতো মাকে করি অন্বেষণ আপন ভাবধারার মাঝে!

মাগো! তুমি কত দূরে—কবে দেখা দেবে মা! শ্রীরামকৃষ্ণ যেমনি করে পেয়েছিলেন—শ্রীশ্রীরামপ্রসাদ যে মাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সাক্ষাৎ জননী-রূপে একান্তভাবে পেয়েছিলেন—তেমনি করে তোমায় পেতে চাই মা! তোমাকে একটু ছোঁব—তোমাকে একটু দেখ্‌বো—তোমার রাঙ্গাপায়ে মাথা রাখবো—দেবে না মা? কেন দেবে না?

পূজা করতে পারি না-প্রাণভরে ডাকতে পারি না—তাই কি তুমি আমার কাছে আসবে না মা? তবে শিখিয়ে দাও না মা, কি করে তোমার পূজা কোরব—কোন রূপ নিয়ে তোমার ধ্যান কোরব? কিন্তু মাগো! তুমি তো জান—তোমাকে তো আমি ভালবাসি; তার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই মা—তবে সংসারের তাপে ভুল হয়ে যায় মা তোমাকে—কিন্তু হারিয়ে তো কখনও ফেলিনি তোমায়—তুমি তো আমার সব কাজেই জড়িয়ে আছ মা! তুমিই তো আমাকে চালাচ্ছো—তুমিই তো আমাকে বলাচ্ছো—তুমিই তো আমাকে করাচ্ছো—তবে কেন দেখা দেবে না মা?

এস' মা এস—বোসো মা বোসো!—আমার দেহের প্রতিটি রক্ত-বিন্দুর কণায় কণায় আসন পেতে বোস মা!

তোমার ইচ্ছা কি বলতো? আমাকে দিয়ে কি করাবে? তোমার ইচ্ছা তুমিই জানো মা; নিজেও ধরা দেবে না, কাছেও টেনে নেবে না, তবে কোন্ কাজের জন্যে ফেলে রেখেছ, বলতো মা?

তোমার চিন্তায় অস্থির করে রাখ আমারে—পাগল করে দাও—ভুলিয়ে

দাও সব কিছু জাগতিক জীবনের চাওয়া পাওয়া! পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, কিছুই আমি জানতে চাই না—শুধু জানতে চাই তোমাকে!

লোক-লজ্জা, ভয়—সব ঘুচিয়ে দাও মা—পথে পথে যেন তোমাকে না পাওয়ার ব্যথায় কেঁদে কেঁদে ফিরতে পারি। জীবনের অসহ্য অনুভূতির মাঝে মুক্ত করে দাও মা, ডুবে থাকতে দাও তোমারই মাঝে আমাকে—সন্তানের এ মিনতি কৃপা করে রাখো মা!

* * *

একাগ্র মনের যে সাধ্য ও সাধনা সে মোর কোথায়? কোন্ স্রোতের টানে ভেসে চলেছি, জানি না তো হায়! বিভ্রান্ত মনে যে রূপ তোমার দেখি, সে রূপের নেশায় পাগল হোলাম কই? মনের মাঝে যে সুর বাজে, অন্তরে এসে দোলা লাগে সেই সকরুণ আবেদন—দেখা দাও মা, দেখা দাও! সংসারের তাপে চোখের জল শুকিয়ে আসে, মুহূর্ত্তের মধ্যে জেগে ওঠে কর্ত্তব্যপরায়ণ মন।

আরে বোকা মন—সংসারের কর্ত্তব্যের বোঝা বইতে কি তোমার শ্রান্তি আসে না? তবে কেন এই আঁকড়ে থাকবার প্রচেষ্টা? তুই কে—তোর কোরবারই বা কি আছে, ভাববারই বা কি আছে—সবই তাঁর কাছে ফেলে দে না!

** কত কথাই মনে হয়—চঞ্চল মন, কোথা থেকে কোথায় যে হারিয়ে যায়, নিজেই বুঝতে পারি না যে! অন্ধকারে হাত্ড়ে হাত্ড়ে সারাজীবন ধরেই খুঁজতে হবে নাকি পথ? না, আলোর মধ্যে শেষ হবে—কি জানি? তোমার অপরূপ রূপের আলো কোথায় লুকালে 'মাগো'? কালো রূপের ছদ্মবেশে কেন ধরার আলোকে ঢেকে রেখেছ বল তো? এ তোমার কেমন ধারা? সারাজীবনই চোখ বেঁধে রেখে কানামাছির মত হাত্ড়ে হাত্ড়ে খোঁজাবে নাকি? তোমার খেলা ছেড়ে, রঙ্গ রেখে, চোখের বাঁধন খুলে দাও মা! নয় তো, আমার কোন আপত্তি নেই, যদি তুমি আমার হাত ধরে ঠিক জায়গা মত পৌঁছে দাও।

মাগো! চোখ বেঁধে দিয়ে দূরে সরে যেওনা মা! জগতের পথ বড়ই পিছল—একা একা কি করে চল্‌বো, বলতো? বার বারই তো পিছ্‌লে পড়ে যাবো—তা'হলে কি তোমারই ভাল লাগ্‌বে—? বল, মাগো, বলো।

মাগো মা! তোমার অরূপ রূপের আলোয় উদ্ভাসিত করো দিক ও দিগন্ত! অন্ধ চোখের দৃষ্টি ভেদ করে সে আলো—জ্যোতি পৌছায় যেন মনের অন্তর-দ্বারে—সে দৃষ্টি মিশে যাক্, বিলীন হয়ে যাক্ তোমারই মাঝে! তোমারই দৃষ্টি দিয়ে যেন এই বিশ্বজগৎ দেখতে পারি, তোমারই মাঝে যেন মিলিয়ে দিতে পারি নিজের অহং সত্তাকে—আমার বলতে যেন আমার কিছুই না থাকে! সম্পূর্ণভাবে যেন নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আমার মাঝেই যেন তোমাকে খুঁজে পাই মা!

তুমি দূরে সরে যেও না মা! যুগে যুগে কত সাধক, কত অভাজন, কত ভাবেই না তোমাকে পেয়েছেন!

মাগো! তোমার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা—দাও আমাকে সেই হৃদয়, যে হৃদয়ে তুমি আসন পেতে বসে গান গেয়েছিলে আপনভাবে বিভোর হয়ে—আমাকে সেই ব্যাকুল বাসনা দাও, যা শুধু ব্যাকুলতায় ঝঙ্কারিত হয়ে উঠেছিলো তোমাকেই ঘিরে—যে বাসনা শুধু মনেপ্রাণে জড়িয়ে রেখেছিলো তোমাকে পাবার আকুলতা! চঞ্চল মন আমার নিজের আত্মায় যেন আত্মস্থ হয় মা—তোমাকে পাবার বাসনায়—তোমাকে খোঁজবার বাসনায়! সে পথের সাথী একমাত্র তুমি যে মা আমার!

মাগো! এই ছাখো তোমার পা শক্ত করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে—তোমার শ্রীচরণের 'পরে মাথা রাখলাম—কেমন করে ছাড়াবে তুমি ছাড়াও তো? দেখি তোমার শক্তি কত? তুমি মনে কোরনা তোমার চেয়ে আমার শক্তি কিছু কম আছে!

কেন জ ন মা? তোমার সন্তান না আমি? তোমার শোণিত-ধারা যে বইছে আমার দেহে। তোমার শক্তিতে তাইতো হয়েছি শক্তিময়ী—

তোমার গর্ব্বে হয়েছি গর্ব্বিতা। তোমার অভয়ে যে মা, আমি অভয়া; তোমার সম্পদে আমি যে হয়েছি সম্পদ্‌ময়ী; তোমার ভক্তি নিয়েই যে আজ আমি হয়েছি ভক্তিমতী। নিজের শক্তি যে সব বিলিয়ে দিয়ে বসে আছ সন্তানকে—তবে কেন এই বৃথা চেষ্টা দূরে চলে যাবার? যেতে তোমায় দেবো না মা—পারবেনা যেতে—নিজের শক্তির কাছে নিজেই যে বাঁধা পড়েছো, জগৎ-জননী!

মাতৃ-কৃপা-লাভ

মাগো! 'মা! মা!' করে এতদিন যে কেঁদে কেঁদে ফিরেছি সেই অন্তর-আঁথি-জলে আজ কি আমার হৃদয় নির্ম্মল হয়েছে? তাই কি তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ সদ্‌গুরুরূপে, বিশ্বজননীরূপে, মধুর অমৃতময়ী, স্নেহময়ী মা রূপে?

তোমার করুণা-কৃপায় হৃদয় আমার শান্ত সমাহিত। তোমার সন্তান হবার সৌভাগ্যের যোগ্যতা-অযোগ্যতা আমি জানি না—জানতে চাই না; শুধু মা! মা! বলে শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়তে চাই—আর সব বিচার তোমার হাতে!

ইচ্ছাময়ী তুমি, আমার সকল বাসনা পূর্ণ করেছো—স্থান দিয়েছো তুমি মোরে রাঙ্গাচরণে—স্পর্শানুভূতির পরম সম্পদ্ কৃপা করে দান করেছ মোরে—পরমবান্ধবরূপে দাঁড়িয়েছ আমার সামনে মানসী মাতৃমূর্তি ধরি পরমগুরুরূপে!

অসীমের রূপ-বর্ণনা শুধু রয়েছে অসীমত্বে ও বিরাটত্বে, অনুধাবন উপলব্ধির মাধ্যমে। তেমনি আমার মায়ের রূপ সীমার মাঝে অসীমত্বে ছড়িয়ে রয়েছে—হৃদয়ের স্পন্দিত অনুভূতির উপলব্ধির মাধ্যমে!

অন্তরে বাইরে আমার মায়ের জয় ধ্বনিত হচ্ছে—জয় মা জয়—শ্রীশ্রীশোভামাতাজী কী জয়! পরম মাতা শ্রীশ্রীশোভামাতাজী কী জয় আমার মায়ের জয়!

সদ্‌গুরু

সদ্ গুরু তুমি ; মোর জীবনে
করেছো আলোক প্রতিফলিত।
এত কৃপা তুমি করিবে মোরে
এ জীবন কি তা জানিত ?
শুনায়েছ ব্রজের নূপুর-ধ্বনি,
করায়েছ জ্যোতির দরশন—
ধন্য হয়েছে জীবন আমার,
পাইয়া তোমার নামের পরশন।
অন্তর আলোতে, আলোক-বর্ত্তিকা হাতে
চলিয়াছ নির্দ্দেশিতে পথ—
অসীম চিন্তার একই চিন্তা—
সে দিকে চালাইয়া মম মনোরথ।
সদ্‌গুরু তুমি, সঙ্গীরূপিণী
তুমিই আমার মা।
অন্তরযামী, অন্তর তুমি
শুদ্ধ আত্মা পরমা॥
বিশুদ্ধরূপিণী শুদ্ধ সনাতনী
পরম অভয়া, শুভদা, বরদা, ক্ষমা।
প্রাণের অন্তরে তুমি
সহস্রশতদলবাসিনী, অমৃতমন্থনী মা॥
ব্রহ্মময়ী মা তুমি, স্নেহময়ী মা।
পরমকল্যাণময়ী তুমি আমাদের মা॥

লীলাময়ী মাগো তুমি
লীলা-অবতার,
কৃপাময়ী মাগো তুমি
জগৎজন-উদ্ধার !
ব্যাকুল হৃদয়ে অন্তর-আঁখিজলে
কত বারে বারে।
মা ! মা ! বলে ডেকেছি তোমারে ॥
পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ফিরিয়া
খুঁজিয়া তোমারে ফিরেছি।
কোথায় লুকায়ে ছিলে তুমি 'মাগো'
এত দিন পরে তোমায় পেয়েছি ॥
কোথায় লুকায়ে ছিলে তুমি বল।
কেন তুমি মোরে করিলে গো ছল ?
আঁখি-জল ঝরি ঝরি হৃদয় আমার
এত দিনে হয়েছে কি নির্ম্মল ?
দিন রাত্রি ছিল না বিরাম,
করিয়াছি মা মা নাম—
আজি দেখি মাতৃমূর্ত্তিধরি
দাঁড়ায়ে সম্মুখে আমার।
আমারি সদগুরু রূপে
মধুর-রূপিণী 'মা আমার' ॥
হৃদয় আমার পূর্ণ আজিকে
আনন্দে বহিছে অশ্রুধারা।
আনন্দময়ীরূপ আনন্দে অধিষ্ঠিতা
শ্রীশ্রীশোভা মাতা পরাৎপরা ॥

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-আগমনী

বাংলা তারিখ—১৩২৭ সন ১৪ই ফাল্গুন, শনিবার

ইংরাজী তারিখ—১৯২১ সাল ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

বাহান্ন বৎসর পূর্ব্বে এসেছিল এই ধরণীতে পুণ্যতিথি ১৪ই ও ১৫ই ফাল্গুনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের সন্ধিক্ষণে বসন্তের সমারোহে উতলা বায়ে। ফাল্গুনের ছোঁয়া লেগেছিল বনে বনে—লাল পলাশের রঙে রঙ্গীন ছিল দিনগুলি। নবীন সতেজ পত্র সম্ভারের সম্ভাষণে বৃক্ষসকল আনন্দে বিহ্বল—বসন্তের সমীরণে ফুল্ল কুসুমিত ফুলের মৃদু সুগন্ধে সুবাসিত, পবন-হিল্লোলে মন ও প্রাণ সুন্দরের আবেশে আবিষ্ট। আম্রকুঞ্জ নবোদ্গত মুকুলের মধুর গন্ধে সুরভিত, মৌমাছি আনন্দে মগ্ন মধু আহরণে—কোকিলের কুহু কুহু তানে কুঞ্জবন মুখরিত। পাপিয়া আকুল স্বরে ডাকৃছে পিউ কাঁহা বলে—মনে হয় নিজের অন্তরেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রেয়সী রাধাকে। শীত যাই যাই করেও থম্‌কে দাঁড়িয়েছে ক্ষণ তরে—বসন্তের রূপ রস, গন্ধ অন্তরে নিয়ে যাবে বলে। এমনি ফাল্গুন নিশি, ধ্যান-মৌন রাত্রির স্তব্ধতা। কৃষ্ণা পঞ্চমীর হিমেল আবছা জ্যোৎস্নায় স্নাত, স্বচ্ছ কুয়াশার অবগুণ্ঠনে মুখটি ঢাকা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সাধকের সাধনা—কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সজাগ। রাত্রি গভীর যামে উত্তীর্ণ হয়ে প্রত্যুষের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত গগন—প্রভাতের মিলন-আশায় উন্মুখ। শান্ত সমাহিত গভীর ধ্যানে মগ্ন প্রকৃতি ও পৃথিবী—মহাযোগাসনে একাত্ম হয়ে নিজেদের উৎসর্গ করছে স্রষ্টার শ্রীচরণে। স্বাতী নক্ষত্র গগনে জাজ্বল্যমান, নীরব প্রহরী—মায়ের আবির্ভাব আগমনীর উজ্জ্বল অলোক-বিন্দু-দর্শনে আপন আলোতে আপনি আত্মহারা!

সময় ৪-২০ মিনিট—যামিনী ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণে সূর্য্যের শুভ্রস্নিগ্ধ আলোর আশীর্বাদের অপরূপ রূপটি নিয়ে মাতা সুরুচিদেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূতা হলেন—পরমভক্ত পিতা সুকুমার রাহাকে পূর্ণ ও ধন্য করে—পূজ্যপাদ পরমদয়াল গুরু শ্রীশ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের মানস-নন্দিনী—পরম

আদরের দুলালী—শ্রীশ্রীশোভামা—আমাদের মা—অরূপরূপের শোভায় দশ দিক উদ্ভাসিত করে—এলেন ধরণী-ধূলাতে মাতুলালয়ে শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ গ্রাম করি উতরোল আপনার রোলে।

ধরণী করিল তারে সাদরে গ্রহণ। মাতা বলি পূজিল চরণ-যুগল। কুলায়ে কুলায়ে বিহঙ্গ-বিহঙ্গী ধরিল সুমধুর তান ; অর্ধস্ফুট পুষ্পকলি হইল পূর্ণ প্রস্ফুটিত, সাদরে মায়েরে করিতে গ্রহণ। জল স্থল গগন গাহিল মায়ের আগমনী—উঠিল ওঁকার ধ্বনি—মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি দিলো পুরনারী—বাজিল শঙ্খ, নাশ করি তমসার স্তব্ধতারে। অবতীর্ণা মা যে মোদের আনন্দময়ী শিশু-রূপ ধরি। শক্তিময়ী মা যে মোদের এসেছেন ধরায়—হাতে লয়ে প্রেমের বাঁশী—হৃদয়ে লয়ে অপার করুণার মাতৃস্নেহরাশি—মুছায়ে দিতে শোক-তাপ-জ্বালা, পরমগুরু-রূপে—স্নেহের বাঁশীর সুরে!

অভয়ে সন্তান তব যাচে আশীর্বাদ
তোমার চরণে রাখিয়া অনন্ত প্রণিপাত।
অনন্ত শোভার আধার তুমি,
তুমি মাতা শোভাময়ী—
আলোক-ধন্যা তুমি মাগো
আনন্দে আনন্দময়ী।

শ্রীশ্রীমায়ের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে

(১৯৭০ মে থেকে ১৯৭৩ জানুয়ারীর দিনগুলি)

১

মাগো ! তুমি ছোট্ট হলেও প্রকারে বিশাল,
সবই যে তোমাতে বাঁধা দিয়ে মায়া-জাল।
তোমা ছাড়া কেহ নাই, কিছু নাই আর—
এ বিরাট বিশ্বের মাঝে তুমি একাকার।
একক অখণ্ড ব্রহ্ম অণু পরমাণুতে—
তুমি যে মা বিরাজিছ অপার অনন্তে।

যখন না ছিলো দিবা না ছিলো রজনী—অনাদি অনন্তকালে—অতীত বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের কালের প্রবাহে, যুগে যুগে তব যাওয়া আসা বিরাম-বিহীন ; বর্ত্তমানে তুমি এসেছ ধরিয়া কায়া, সন্তান-জননী-রূপে, আপনার হাতে সাজায়ে দিতে মঙ্গল-প্রদীপ সন্তান-কল্যাণ-তরে !

মায়ের সাথে সন্তানের যে নিবিড়তম যোগসূত্র। সে যত দূরেই থাকুক না কেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছোঁওয়া রয়েছে—সহজ সরল স্বরে ছোট্ট 'মা' নামে। নামটি আকারে ছোট্ট হলেও প্রকারে বিশাল—প্রতি অণুপরমাণুতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই মধুমাখা মা নামটি ছড়িয়ে আছে !

তাই মাকে যখন খুঁজে বেড়াচ্ছি—আমার অবোধ অজ্ঞান মন তখন কি জান্‌তো—মা অন্যপ্রান্তে বসে রয়েছেন দু'হাত বাড়িয়ে সন্তানকে পরম অভয় দিয়ে কোলে টেনে নিতে ? মূর্খ আমি, তাই বুঝতে পারিনি—শ্রীশ্রীমায়ের সূক্ষ্ম আবির্ভাবে পৃথিবীর সব একাকার—সব একসাথে বাঁধা—সবই তাঁর গোচরীভূত !

কলকাতায় বসে, সুদূর বেনারসে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা কি নিবিড় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমার জীবনে জড়িয়ে ছিলো, তাকি আমি জান্‌তাম ? একটি ভুল-

ত্রুটির মাধ্যমে স্নেহময়ী মা আমার সমস্ত দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে, সহর্জ ও নিবিড়ভাবে আমাকে কাছে টেনে নিলেন! আমার মনে হয়, এই ভুলটি শ্রীশ্রীমায়ের দেওয়া পরমরত্ন—তাঁর সাথে পরম যোগাযোগের সহজ অধ্যায়—মনোময় কোশে মনোজগতের সঞ্চিত রত্নরাশি—মায়ের স্নেহের ভাণ্ডারের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ!

বেনারস থেকে পত্রযোগে এলো মায়ের আহ্বান—১৯৭০ সালের মে মাসে শ্রীশ্রীশোভামা আসছেন কল্যাণীতে—সুবিধা করে যেয়ে দেখা করতে।

মনটা আমার বিশেষভাবে তোলপাড় করে উঠলো; তার উপর মনে আছে অপরাধ-বোধ। কিন্তু, তা সত্বেও অজানিত পুলকে মন ভরে উঠতে লাগলো—আমার 'মা-ময়' জীবনে সূক্ষ্ম মায়ের অনুভূতি এসে দোলা দিতে লাগলো—তাই, মনে মনে জানালাম, আমার অন্তরের প্রণাম।

শ্রীশ্রীশোভামায়ের কথা তখনও বিশেষ কিছু আমি জানি না; অজ্ঞান আমি, তাই তখন সেই কথা ভেবেছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা—ইচ্ছা না হলে সারাজীবনের অন্বেষণেও কি জানতে পারবো তাঁকে! যুগে যুগে কত সাধকই মাতৃঅন্বেষণে জন্ম-জন্মান্তর দুর্লভ সাধনা করে গিয়েছেন। আমি সাধনহীন, ভজনহীন, মায়ের কৃপা ছাড়া আমার কোন গতি নেই!

পরম শ্রেয় কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়—তাই অজানিতভাবে এল আমার ছোট পুত্রের দিল্লীতে দারুণ দুর্ঘটনার খবর। সাময়িকভাবে মন বিচলিত হলেও মনে এনে দিল পরম নির্ভরতা ও প্রশান্তি ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে পরম-প্রাপ্তির নিদর্শন। সুপ্তি ও জাগরণের মাঝে পরম দর্শন।

স্বপ্নে দেখলাম—আলুলায়িত-কেশা, রক্তাম্বরা, অপূর্ব্বশ্রীমণ্ডিতা, মধুর-মাতৃমূর্ত্তি, বরাভয় দানে অভয়া—স্ফুরিত অধরে সহাস্যবদনা, উজ্জল আলোকবর্ণা, শুভ্রা জগদ্ধাত্রীরূপে—মা এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে। 'মা-মাগো' বলে তাঁর চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিলাম—পেলাম শ্রীশ্রীমায়ের অভয় বাণী—"আমি তো তোর সাথেই রয়েছি।"

তখন পর্য্যন্ত স্থূলভাবে মায়ের সাথে আমার যোগাযোগ হয়নি। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় দর্শন আমি পেয়েছিলাম—সেটি তাঁর অহেতুক বিশেষ কৃপা—যা ছিল আমার দুর্দ্দিনের পরম সম্পদ্—জাগ্রত নিদ্রিত অবস্থায় সাথের সাথী। একটি অতি সুন্দর খয়েরী গোক্ষুর সাপ—যার সমস্ত শরীরটা ছিল মসৃণতায় উজ্জ্বল, চকৃচকে—ফণার নীচে ছিলো অতীব শঙ্খধবল রং—আমার চোখের সামনে ফণা বিস্তার করে নিজের দেহের অর্দ্ধভাগের উপর দাঁড়িয়ে দুলছে—মাঝে মাঝে বের করছে তার সরু লিকৃলিকে জিহ্বা। চোখ দুটি থেকে ঠিকৃরে পড়ছে নীল দ্যুতি—মনে হচ্ছে, চোখে হীরা বসানো রয়েছে। মাঝে মাঝে যখন ফণাটা নামিয়ে নিচ্ছে তখন মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নদুটি, যা মস্তকে দাগ স্বরূপ রয়েছে—ঝকৃঝকৃ করে উঠছে, মনে হচ্ছে কত মণি, মরকত, চুণি পান্না বসানো সবুজের মাঝে রামধনু রঙ খেলে যাচ্ছে। সাপ যে এত সুন্দর হতে পারে—এত স্বর্গীয় সুষমা ধারণ করতে পারে, জীবনে কল্পনায়ও কখন আনতে পারিনি। সতের দিন আমার চোখের সামনে তাঁর দর্শনে অমাকে অভিভূত করে রেখেছিলো—এই অনুভূতির উপলব্ধি আমার এ লেখনীর সাধ্য নেই বর্ণনা করে।

তবে এখানে বলে রাখি—সবার বিশেষ অনুরোধে আমি দিল্লী যাইনি। আমার ছেলেকে দেড়মাস পরে যখন এখানে নিয়ে এলাম তখন শুনলাম ১১ দিন পর্য্যন্ত আমার ছেলের জীবনের আশা ডাক্তাররা দেননি। ১৮ দিনের দিন তারা ফাঁড়া কেটে গিয়েছে বলে জানান।

মাগো! তোমার সাথে যোগাযোগ আর এই দুর্ঘটনার সাথে কি সূত্র আছে জানি না, তবে আমার এই বিপদের দিনে তুমি যে সর্বতোভাবে আমাকে জড়িয়ে ছিলে তার নিদর্শন তুমি দিয়ে গিয়েছো—তাতে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। 'জয় মা'!

শ্রীশ্রীমা কল্যাণীতে এসে গেছেন, চিঠির মাধ্যমে খবর পেলাম, কিন্তু নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কল্যাণীতে যাবার সময় করতে পারছি না। কিন্তু

কি মূর্খ আমি! মায়ের সাথে যোগাযোগের ও সাক্ষাতের সময়ই যে মা নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন—সে বোঝ্‌বার মতন ক্ষমতাও আমার হয়েছিল কি?

যখন নির্দিষ্ট সময় হল, ঘুড়ির সূতা ধরে টান পড়লে যেমন টানে—সেই রকম প্রেরণা এলো কল্যাণী যাবার। মা ও মেয়ের নাড়ীর টান—তাকে রোখে সাধ্য কার!

জুলাই মাসের প্রথম দিকে মনে হোল আজই আমাকে কল্যাণীতে যেতে হবে—সময় বহে যাচ্ছে। অদ্ভুত আলোড়নে মথিত হতে লাগলো আমার মন-প্রাণ—বিশেষ ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে। সংসারের বিশেষ কিছু কর্ত্তব্য কাজ ছিলো; সময়ের আগেই কাজটি শেষ হওয়াতে ট্রেন ধরবার উদ্দেশ্যে ছুটলাম। সময়মত ট্রেন এলে—পাওয়া অসম্ভব। তবুও মায়ের নাম নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলাম কালীঘাট ষ্টেশনে। এসে দেখি ইলেকট্রিক ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—লাইন্‌ ক্লিয়ার না পেয়ে। আমি কামরাতে উঠে বসতেই ট্রেন হুইসেল্‌ দিয়ে ছেড়ে দিলো।

মাগো! অশেষ তোমার কৃপা—জীবনের কত সমস্যাতেই তোমার অযাচিত কৃপা বহুবার পেয়েছি—তবুও তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারছি কই?

চলেছি কল্যাণীর পথে—সেদিনকার মনের ভাব বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। মনের মধ্যে একটি সুরই বাজছিলো—মায়ের কাছে যাচ্ছি—মায়ের কাছে যাচ্ছি। ট্রেনের চাকাতেও যেন অনুরণন হচ্ছে একই শব্দ। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে তখনও চাক্ষুষ সাক্ষাৎ আমার হয় নাই—তবুও মনে নাই কোন অচেনার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব—শুধু, কি জানি একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির আবেগে মন পূর্ণ হয়েছিল।

কোথায় সন্ত-আশ্রম জানি না—তবু মনে নাই কোন শঙ্কা—মা'ই তো রয়েছেন—পরম নির্ভয়। সত্যিই, তিনি যেন হাত ধরে এনে পৌছে দিলেন সন্ত-আশ্রমের বহির্দ্বারের সামনে। দরজা বন্ধ—তখন বেলা ১২টা পার হয়ে

গেছে। ভাবছি কি করবো—এমনি সময় আশ্রমের ভেতর থেকে গেটের ছোট দরজা দিয়ে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করতেই ঐ দরজা দিয়ে আমাকে ভেতরে যেতে বললেন।

এতক্ষণ অপার্থিব আনন্দে মশগুল ছিলাম; কিন্তু, তখন যেন খানিকটা দ্বিধা-সঙ্কোচ মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগলো—মাতৃদর্শনের আশায় লালায়িত মন দর্শন-আশায় উন্মুখ হয়ে উঠলো।

আশ্রমে ঢুকে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাদার খোঁজ করতেই তিনি বেরিয়ে এলেন—তাঁর সাথে আমার কিছুদিন পূর্ব্বেই পরিচয় হয়েছিল। তিনি ও ব্রহ্মচারিণী শ্রদ্ধা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের সাথে যোগাযোগের প্রথম সূত্র—আমার জীবনের এক অধ্যায় শেষ করে আর এক অধ্যায় সুরু কোরবার পথ-প্রদর্শক। আমার অন্তরের চির কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা তাদের জানাবার আমার ভাষা নেই। এখানে রামদার একটু পরিচয় দিই—শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল মুখার্জ্জি মায়ের পরম ভক্ত এবং ছোট শিশুর মতন মায়ের উপর নির্ভরশীল।

আমাকে দেখেই রামকৃষ্ণদা শ্রদ্ধাদেবীকে ডেকে নিয়ে এলেন। তার সাথে এই আমার প্রথম দেখা। তার অতিশান্ত ও মিষ্টি কথায় মন ভরে গেলো। শুনলাম শ্রীশ্রীমা তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন—বিকাল ৪টার সময় দেখা হবে। দর্শনের আকুল আশায় বুকের ভেতরটা ব্যথা করতে লাগলো। নীরবে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করতে লাগলাম—বুঝলাম, এখনও আমার সময় হয়নি। হয়নি প্রতীক্ষার সমাপ্তি—মনের আকুলতার পূর্ণ অর্ঘ্যটি হয়তো মাকে দিতে পারিনি। প্রতীক্ষার পরে আসবে অনুগ্রহের অমৃত-প্রসাদ—সেই আশাতেই রইলাম।

তখন আশ্রমের সবার প্রসাদ নেওয়া শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু আমার বার বার নিষেধ সত্ত্বেও "সু" মণি (এই নামেই আমরা শ্রদ্ধাদেবীকে ডেকে থাকি) অতি যত্ন করে অন্ন-প্রসাদে পরিতৃপ্ত করলেন। আমি কি রকম অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম—ভাবছিলাম এরাই এত সুন্দর—আমার মা জানি

আরো কত সুন্দর। আমার অবোধ মন, তাই অবোধের মতনই চিন্তাধারা। এদের জড়িয়েই যে শ্রীশ্রীমা রয়েছেন সে বোধ হোল কই? পরে জেনেছি, দেখেছি—মায়ের মন্দির থেকে প্রসাদ না পেয়ে কেউ অভুক্ত ফিরে যেতে পারে না।

প্রসাদ-প্রাপ্তির পর 'সু'মনি আমাকে নিয়ে এলেন দোতলায় সুন্দর একটি হলঘরে। ঘরে ঢুকে ডানদিকে তাকিয়ে দেখি বিগ্রহ-মন্দির রয়েছে—দরজা বন্ধ থাকাতে মনে মনে প্রণাম জানালাম। বারান্দার দিকের দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম—বহুদূর পর্য্যন্ত সজীব নবীন সবুজের দৃশ্য। চোখ জুড়িয়ে যায়—আর মনের অন্তঃস্থল থেকে মনে হয়, এই তো নব-দূর্বাদলশ্যাম, দিকে দিকে তাঁর রূপটি নিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। বহুক্ষণ এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই ডুবে ছিলাম। মনে ছিল অপেক্ষিত মহামিলনের অপার আনন্দ—মন যেন গভীর প্রশান্তিতে সমাহিত—মাতৃদর্শনের আশায় মন আবেগে উদ্‌গ্রীব। হলঘরের চারদিকে শ্রীশ্রীমায়ের নানা রূপের প্রতিকৃতি সাজানো ছিল। একটি ফটোর 'পরে দৃষ্টি আমার স্থির হয়ে গেলো। নবঘন-শ্যামরূপে 'মা'—হাতে বাঁশী, শিখি-পাখা শিরে, চরণে চরণ দিয়ে বসে আছেন। অপরূপ সে মূর্ত্তি। মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণজীই সেখানে অধিষ্ঠিত—এমন কি শ্রীচরণ দেখলেও মনে হয় না কোন নারীর চরণ—স্বয়ং সেই পরম পুরুষেরই চরণ। তখনও মায়ের দর্শন লাভ করিনি—মনে মনে মায়ের চরণের রূপ চিন্তা করছিলাম। বেলা প্রায় তিনটার সময় দেখলাম মায়ের মেয়েরা সব হাসিমুখে যে যার কাজ সেরে স্নান করে এসেছেন—তাদের কাজের মধ্যে যেন আনন্দ ঝ'রে পড়ছিলো।

এই আনন্দের উৎস যে কোথায় বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হোল না। কোন প্রাণময় উৎসধারার স্রোতে যেন সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। শ্রদ্ধাদেবী একটা চিঠিতে লিখেছিলেন "বিভিন্ন ধারায় এসে আমরা মায়ের কোলে মিলিত হই—এই তো আনন্দ আর শান্তির পরম উৎস।" মনে মনে উৎসধারার

চরণে প্রণাম জানালাম। মন আমার আনন্দে ভরপুর হয়ে আস্‌ছিলো— কোথা থেকে আসছিলো এই আনন্দ, আমিই কি জানি ?

হলঘরের বাঁ দিকের কোণে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য আসন স্থাপিত ছিলো। সেই আসন পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখছিলেন সন্ধ্যাদেবী। আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম শ্রীশ্রীমায়ের আসবার সময় প্রায় আগত। ইতিমধ্যে একবার নীচে নেমে পরম শ্রদ্ধেয় (শিশির কুমার ব্রহ্মচারী) শ্রীশ্রীমায়ের 'ভাইদার' সাথে পরিচিত হয়ে এলাম। সুপণ্ডিত ও সুবক্তাই শুধু নন, তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের প্রিয় শিষ্য, শ্রীশ্রীমায়ের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতা ও মায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়ক।

নিজেকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করছিলাম—কি ভাবে মায়ের কাছে নিজেকে স্থাপিত করবো—কুণ্ঠাজড়িত দ্বিধা মনের মাঝে দোল দিচ্ছিল। এমনি সময় শ্রীশ্রীমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আসন গ্রহণ করলেন। মাতা— সদ্যঃস্নাতা, আলুলায়িত-কুন্তলা, ছোট্ট, লাবণ্যময়ী, আনন্দময়ী মূরতি— পরণে লাল জরির পাড় শাড়ী। আনন্দের আবেগে মনে হচ্ছিল, মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি ছোট্ট মেয়ের মতন। মনের ইচ্ছা মনেই রেখে, সবার সাথে আমি ও প্রণাম কোরলাম ভূমিষ্ঠ হয়ে—বিশেষ করে লক্ষ্য কোরলাম শ্রীচরণযুগল ঃ ছোট্ট দু'টি চরণে যেন মাখনের মসৃণতা—সাথে স্নিগ্ধ রাঙ্গা রঙ-এর দীপ্তি। আননে স্নেহপূর্ণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি—স্নেহময়ী মাতৃরূপের সমস্ত মাধুরিমা নিয়ে অধিষ্ঠিতা।

অনেকেই সেখানে বসে রয়েছেন। কিভাবে কথা আরম্ভ কোরব ভাবছি— আর মনে মনে মা, মা, কোরছি। এরি মধ্যে মধুর হেসে আমার সমস্ত সংকোচ ঘুচিয়ে, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এসেছ ? অসুবিধা হয়নি তো ?"

আমি বোল্লাম—"তুমিই তো আমাকে নিয়ে এসেছো। তুমি কি জান্‌তে মাগো, আজ আমি আসবো ? বলনা, মাগো—?" কিভাবে এত সহজেই এই কথাগুলি বলে ফেল্লাম নিজেই জানিনা।

শ্রীশ্রীমা আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা হাসি। মুখের হাসিও যে ঝঙ্কারিত হয়ে বাঙ্ময় হ'তে পারে ও তার সুললিত ধ্বনি যে প্রতিটি তন্ত্রীতে যেয়ে মৃদু মূর্চ্ছনাতে অপূর্ব্ব রেশের সৃষ্টি করতে পারে এ অভিজ্ঞতা আমার ছিলো না; সে হাসির রেশ রিনিঝিনি সুরে আমার অন্তরে ও সর্বাঙ্গে ধ্বনিত হতে লাগলো। সমস্ত মন প্রাণ যেন একান্ত সহজ সরল হয়ে, দূরত্ব ঘুচিয়ে, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নিজেকে উজাড় করে সমর্পণে উন্মুখ হয়ে উঠলো।

আমি বোল্লাম—"মাগো আমার অজানিত অপরাধ ক্ষমা কোরো—এযে মিথ্যা হতে পারে কল্পনা করতে পারিনি—পারিনি অবিশ্বাস করতে।"

শ্রীশ্রীমা আবার হেসে উঠ্লেন। অপার্থিব হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই শুনছি—মা বলছেন—"তোমার অপরাধ কোথায়? আজ যদি আমি আমার ভক্ত সন্তানদের—যারা আমার কাছে আসে, তাদের কোন কথা বলি—তারা যেমন সরল ও গভীর বিশ্বাসে মেনে নেবে আমার কথা—বিনা বিচারে—এই ব্যাপারে তোমার পক্ষেও সেই কথা। আমি তো তোমার কিছুমাত্র অন্যায় দেখ্ছি না। দেখো মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সর্বকাজেই মঙ্গল নিহিত থাকে—এই জন্যেই তো তোমার সাথে যোগাযোগ হোল।"

মনে ভাবলাম, সত্যিই তাই; নাহলে এমন মা পেতাম কোথায়? হৃদয়ের সমস্ত ভার নেমে যেয়ে চোখে জল এসে গেলো। জয় মা জয়! এই না হলে তুমি মা—স্নেহময়ী, ক্ষমাময়ী, বিশ্বজননী, অমৃতরূপা, অন্তর্য্যামী মা? কত সহজ সরলভাবে সন্তানের সমস্ত অপরাধ ও মনোব্যথা নিজের অপার স্নেহ দিয়ে ভুলিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলে—একাত্মরূপে তোমার সন্তানের মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দিলে!

সত্যিই তখন সব সঙ্কোচ কেটে যায়; আমার মনে হোল—মায়ের সাথে আমার যুগ-যুগান্তের পরিচয়; যে মায়ের চরণে চির আশ্রয় কামনা করেছি সেই মায়েরই সম্মুখে আজ আমি উপস্থিত!

প্রথম থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের সাথে আমার "তুমি" সম্বোধন বেরিয়ে এলো—ভাবি, মায়ের যা ইচ্ছা তাই হোল।

মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার ছোট ছেলেটি ভাল আছে তো? কিভাবে দুর্ঘটনা হোল?"

দুর্ঘটনার ইতিহাস বলে আমি বোললাম—"এখনও অনেকদিন ভোগ আছে।" তখন মাকে সেই সময়কার দর্শনের কথা বলাতে, মা বললেন—"অনন্ত শক্তি তোমার ছেলেকে রক্ষা কোরবার জন্যে তোমার সাথে ছিলেন—খুব সুন্দর দর্শন—নিজের মধ্যেই রেখো।"

মাগো! আজ অন্তরে তোমার অনুমতি নিয়ে সর্বসম্মুখে প্রকাশ কোরলাম—না হলে যে আমার মায়ের কৃপা, অনুগ্রহ ও করুণার কথার মধ্যে ফাঁক থেকে যাবে। আমি জানি, তোমার সাথে অন্তরে সূক্ষ্ম যোগাযোগের মাধ্যমে তুমি আমাকে অনন্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করেছ—নানা ভাবেই সে পরিচয়ের চিহ্ন তুমি রেখে দিয়েছো আমার অন্তরে; না হলে, দুর্ঘটনার খবর পেয়েও যে আমি যেতে পারলাম না—সে মনে হয় তোমার ইচ্ছায়—সেই জন্যেই কৃপা করে তুমি দিয়েছ অনন্তশক্তিরূপে দর্শন—দিয়েছ শক্তি ধৈর্য্য ও নির্ভরতা।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সব অন্তরের কথা জানাতে সাধ হোল—তাই আবার বোল্লাম—

"মা জানো, আমি কিছুদিন আগে স্বপ্নে দেখেছি—উজ্জ্বল, নধরকান্তি, কষ্টিপাথরের গোপাল—আকারে একটি ছোট শিশুর মতন—হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে খাবার চাইছে—সাদা ছোট্ট ছোট্ট দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে। আমি তারপর কত জায়গায় খুঁজেছি—কালো কষ্টিপাথরের গোপাল কোথাও আছে কিনা—কতজনকে জিজ্ঞাসা করেছি—কিন্তু কেউ বলতে পারেনি।"

শ্রীশ্রীমা আমার কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আমার

নীলমণি আছে—কষ্টিপাথরের গোপাল। তিনি ঢাকুরিয়াতে আমার এক ভক্ত সন্তান—সকলের ফুল দির বাড়ীতে সেবা পাচ্ছেন। উৎসবের দিন এখানে আসবেন—দেখো তো তোমার স্বপ্নের সাথে মেলে কিনা?"

শ্রীশ্রীমায়ের সাথে কথা বলতে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম—অনেকেই বসে আছেন আশা নিয়ে, মায়ের সাথে কথা বোলবার জন্তে; আমি লজ্জা পেলাম—চুপ করে রইলাম।

দেখলাম সবাই—আশ্রমিকা দিদি ও বোনেরা—যাওয়া আসা ও প্রতিটি কাজের আগে শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোরছিলেন। মনে তখন একটা প্রশ্ন উঠেছিলো—মা যে একান্ত আপনার, তাঁকে কেন বার বার প্রণাম করতে হবে? কিছুদিন পরে মায়ের কাছে যখন একান্তে বসেছিলাম তখন তাঁর কাছে মনের প্রশ্নটা তুলে ধরতেই, তিনি প্রশান্তমুখে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন বার বার প্রণামের মাধ্যমে কোন্ অর্থ নিহিত আছে। শ্রীশ্রীমা করুণা-কোমল কণ্ঠে বললেন—

"এ দেহটা কি প্রণাম নিতে পারে? তুমি যতবারই প্রণাম করো তাঁর চরণে—শ্রীশ্রীঠাকুরজীর চরণে যেয়ে পৌছায়।"

তখন মানস-চক্ষে একান্তে ভেসে উঠলো কোথায় বিভেদ—সব যে একে একাকার। মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচে গেলো—'জয় মা' বলে তাঁর চরণে ভূমিষ্ঠ হোলাম। তারপর কতভাবে মাকে প্রণাম করেও আরো প্রণামের বাসনা মনেই থেকে যায়। শ্রীশ্রীমাই দিলেন আমার মনে প্রাণে ও কণ্ঠে 'জয় মা' বোলবার অধিকারের ভাষা।

একটু পরে মায়ের পাঠের সময় হোল। মায়ের সুললিত কণ্ঠের ভাবময় পাঠ মুগ্ধ হয়ে শুনলাম—

"ভগবান উপবাসী ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেই ছোট গোয়ালার ছেলের রূপ ধরে, দুধ নিয়ে তাকে পান করিয়ে এলেন—ভক্তের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে।"

এসব উপাখ্যান-কাহিনী তো পড়া ও শোনা ; তবু সেদিন মায়ের কণ্ঠে এ কাহিনীর রূপ যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো।

ধন্য আমি ! মাতৃ-করুণা-সিঞ্চিত প্রাণে শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে ডাঃ শীতাংশু মৈত্রের সাথে তার গাড়ীতে রওনা হয়ে এলাম—মাকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করে।

কত অদ্ভুত পরিস্থিতির মাঝেই মানুষের জীবনে আসে শুভ যোগাযোগ—যা তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে হয় না। লগ্নের পর লগ্ন বহে যায়—পরম লগ্ন আসে, তাঁরই আশীর্ব্বাদে, তাঁরই চরণে প্রণত হবার জন্যে ; সেই পরম লগ্ন এলো আমার জীবনে—শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে !

মাগো মা ! তোমার অবোধ মেয়ে আমি, কোন দিকে ভেসে চলেছি নিজেই তা জানিনা। জানি শুধু, তুমি আছ—তুমি রয়েছ আমার হাত ধরে—সহজ সরল নির্দ্দিষ্ট পথে তুমিই আমাকে নিয়ে যাবে। তাইতো, পরম নিশ্চিন্তভাবে, পরম নির্ভরতায়, তোমার পরে নির্ভর করে বসে আছি ; আমি জানি, যে পথ আমার জন্যে ভাল, যে পথ আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট, সেই পথে তোমার এই মেয়েটিকে নিয়ে যাবে। সেই পথে একমাত্র সাথী তুমি মা আমার—তুমি মা সবার। তোমার পায়ে রাখলাম আমার ভক্তি-প্রণত প্রণাম।

২

সেদিন কল্যাণী থেকে মনে অপার আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম। মাতৃলাভের আনন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের আনন্দ—মন ডুবে গেল তারি মাঝে ; শুধু মায়ের হাসির লহরী জলতরঙ্গের সুরে বাজতে লাগলো মনের গভীরে—মনের গভীরে সুর বাজতে লাগলো—মা ! মা ! মা ! শ্রীশ্রীমায়ের সূক্ষ্ম আবির্ভাবের উপস্থিতি অযাচিত করুণারূপে অন্তরে উপলব্ধি করতে লাগলাম ; অন্তরও বাহির আনন্দে মেশামেশি হয়ে গেলো—সব কিছু আনন্দে

আনন্দময় হয়ে উঠলো—নূতন সুরের নূতন উপলব্ধির মাধ্যমে—মায়ের আশীর্ব্বাদে !

ফিরবার সময় মা বললেন—"উৎসবে এসো।"

আমার আশ্রমিকা বোনেরাও বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন আসবার জন্যে গুরুপূর্ণিমা-উৎসবে।

এখানে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে—আমি গুরুপূর্ণিমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। কারণ, বর্ত্তমানে আমার বাড়ীর পরিস্থিতি এসব ভাবধারার বাইরে। ছোটবেলা ও বিশেষ দেখিনি। কিন্তু, আমার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন এবং শ্রীশ্রীগুরু সন্তদাস বাবাজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন। আমার দুটি ননদও তাঁর নামের কৃপা পেয়েছিলেন। আমার বড় ননদের ১৭ বছরের ছেলের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর সে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের দর্শন পায় ও শোকসন্তপ্ত মায়ের হৃদয়ে তিনিই এনে দেন পরম সান্ত্বনা—এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস—শ্রীশ্রীমাই রক্ষা করেছেন আমার ছোট ছেলেকে। কারণ, তার জীবন ফিরে পাওয়া ডাক্তারী বুদ্ধির বাইরে ছিল।

উৎসবে যাবার কিছু বাধা ছিলো ভেবে, আগেই দেখা করতে মায়ের সাথে, কল্যাণী গেলাম। তাছাড়া, এ ছিল একটা অজুহাত; বড্ড মায়ের জন্যে মন কেমন কোরছিলো—। আমার সাথে আমার ছোট ননদও ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেলাম ; বসে আছেন তাঁর আসনটীতে।

ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করতেই বসতে বল্লেন।

অপলক নয়নে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম—মিষ্টি মিষ্টি দুষ্টু হাসিতে ভর্তি। মাকে বোল্লাম—"মাগো! গুরুপূর্ণিমার দিন তো আমার আসবার সুবিধা হবে না—সেই কথাটি জানাতে তোমার কাছে এলাম।

মা বল্লেন—"সারাদিনেও কি তোমার সময় হবে না? যে কোনও সময়, সময় করে অল্পক্ষণের জন্য এসো।"

মূর্খ আমি—অজ্ঞ আমি—তাই, মাকে আসবার অসুবিধার পক্ষে নানা কারণ দর্শাতে লাগলাম।

মাগো! অন্তরে নেই ভক্তি, নেই আমার শ্রদ্ধা—তবু ও তুমি তোমার নিজ গুণে—"মা-ময়" হয়ে, আমার অন্তর-বাহিরে জড়িয়ে থেকো—আমার শত অপরাধ ক্ষমা করে।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদে নিজেকে পূর্ণ করে ও মিষ্টি প্রসাদে উদর পূর্ণ করে—মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম—কিন্তু অন্তরও মন রেখে এলাম আমার মায়ের শ্রীচরণে—!

জয় মা!

৩

গুরুপূর্ণিমা

মা গো! কত ভাব ও ভাষা মনের মধ্যেই আনন্দে রঙ্গীন হয়ে উঠছে—'ভাবময়ীকে' নিয়ে—সে ভাব ভাষার রূপ দিয়ে মালা গাঁথা আমার মত মালাকরের সাধ্য নেই—শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ কৃপা ছাড়া!

মন শুধু ভেবেই চলে; মায়ের স্মৃতির আলোড়নে অন্তর আবিষ্ট হয়ে ওঠে—সুখ-ভাবনার মাঝে তলিয়ে যেয়ে—মা ও মেয়ের খেলার মাঝে!

মাগো! দাও মোরে ভাষা—দাও মোরে কথা—দাও মোরে তোমার বন্দনার সুর; তোমার স্নেহ-করুণা-কৃপা-কাহিনী—অযাচিত যা দিয়েছ অকাতরে—তা যেন তোমাময় হয়ে ধ্বনিত হয়—প্রকাশে বিকাশে বাজে যেন মাতৃপূজার সুর!

বাড়ী ফিরে সারাক্ষণ শুধু শ্রীশ্রীমায়ের মুখ-নিসৃত একটি সুরই মনে বাজতে লাগলো—'সারা দিনের মধ্যে সময় করে একবার এসো।' বাড়ীতে তখন

লোকজন-অতিথিতে ভর্ত্তি ; কিন্তু, করুণাময়ী মায়ের ইচ্ছাতে কল্যাণী যাবার সুযোগ এসে গেলে। বাড়ীতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কল্যাণী দেখেন নি। তাদের যে দিন যাওয়া ঠিক হোল সেদিনই ছিল শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা-উৎসব। ঠিক হোল বাড়ীতে দুপুরের আহার সেরে কল্যাণী যাওয়া হবে ও আমাকে সন্ত-আশ্রমে নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু, আমি উৎসবের প্রোগ্রামে দেখেছি—সকাল ৯টার সময় শ্রীশ্রীমাতৃপ্রণাম গুরুপ্রণাম আরম্ভ হবে। তাই. মনটা বিষাদে ভরে যেতে লাগলো। কিন্তু, আমি মায়ের ভরসা নিয়ে বলেই ফেললাম—এক কাজ করি, আমি ভোরের ট্রেণে কল্যাণী যাই—তোমরা বরং সন্ধ্যার সময় ফিরবার পথে আমাকে নিয়ে এসো। আমার আগ্রহ দেখে ওরা আর 'না' করতে পারলেন না।

মায়ের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লাম ভোরবেলা কল্যাণীর পথে। মনে হচ্ছিল—বড় আস্তে আস্তে ট্রেন চলছে—গতি মোটেই নেই ; আসলে, আমার তাড়াতাড়ি পৌছবার আগ্রহের গতিবেগের সাথে ট্রেন পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারছিলো না। অবশেষে, পৌনে ন'টার সময় এসে পৌছালাম সন্ত-আশ্রম-প্রাঙ্গণে মাতৃদর্শন-অভিলাষী মন নিয়ে।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম—আশ্রমের ছাদ শামিয়ানার দ্বারা ঘেরা হয়েছে। আশ্রমে তখন আমি নতুন—নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। পৌছে হাতমুখ ধুয়ে মাতৃদর্শনের আশায় দোতালায় গেলাম। শুনলাম, তখন মায়ের দর্শন পাওয়া যাবে না ; কারণ, তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছাদে যাচ্ছেন— শ্রীশ্রীগুরু-প্রণাম সুরু হবে—সবাই শ্রীশ্রীমায়ের জন্যে ছাদেই অপেক্ষা করছেন।

ধীরে ধীরে ছাদে উঠলাম ; বুকের মধ্যে মৃদু ব্যথা করে উঠছিলো—মাকে জানাতে পারলাম না বলে—'মাগো মা—আমি এসেছি।'

মানুষ নিজেকে নিয়ে কতই ভাবে। মায়ের অজানিত কিছু কি থাকতে পারে ? মা তো জানতেনই আমাকে আসতেই হবে—তার জন্যে যে তিনিই

সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন—মনের সংশয় কেটেও কাটতে চায় না আমাদের !

ছাদে উঠে দেখলাম—লোকে লোকারণ্য—শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ও ভক্তেরা এসে জমা হয়েছেন। ভিড় ঠেলে যে এগিয়ে যাবো তাও পারছিনা—নতুন বলে সঙ্কোচ ও কিছুটা। এমনি সময় কানে এলো—'মা আসছেন, তোমরা সরে দাঁড়াও—পথ করে দাও।' আমি ছাদে ঢোকবার দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। সরে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীমাকে দেখতে পেলাম। মনে হোল, তাঁর শুভ কৃপাদৃষ্টিও আমার উপরে পড়লো। মা এসে তাঁর নির্দিষ্ট সিংহাসনটিতে বসলেন। .খুব সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো সিংহাসনটি। শ্রীশ্রীমাকেও তাঁর সন্তানেরা সাজিয়েছেন অনবদ্য সুন্দর সাজে। মাথায় ফুলের মুকুট—হাতের দু'বাজুতে ফুলের গহনা—গলায় শোভা পাচ্ছিল মোটা জুঁই ফুলের গোড়ের মালা—পরণে নক্সাকরা কড়িয়াল গরদের লাল পাড় শাড়ী। আমি দূরে ছাদের এক কোণে যেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেখান থেকে দেখছিলাম, শ্রীশ্রীমায়ের মুখমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতির অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত। ভক্তেরা সবাই মায়ের নাম-গান আরম্ভ করলেন। আর আমি দেখলাম—মা ভাবের সমাধিতে আস্তে আস্তে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন ও মৃদু মৃদু দুলছেন—শ্রীমুখ হাসিতে উদ্ভাসিত—আনন্দের মাঝে আনন্দে নিমগ্ন—সারা অঙ্গে অপরিসীম স্নেহের অভিব্যক্তি—বাহ্যজ্ঞানরহিত !

আস্তে আস্তে মায়ের বরাভয় পাণি দু'টি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে উঠে এসে স্তব্ধ হয়ে রইলো—মনে হোল—মা সন্তান ও ভক্তদের যে যেখানে আছেন—বিশ্বজননীরূপে তাদের তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদের ধারায় সিক্ত করে দিচ্ছেন। তারপর মায়ের হস্ত দু'টি বংশীবাদকরূপে স্থাপিত হোল। মহাভাবে অবস্থিতা মায়ের মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। একটু পরেই দেখি মায়ের দুটি পাণি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করলো, মহা-মহাভাবে—যুগল-মূর্ত্তিরূপে—শ্রীশ্রীরাধা ও কৃষ্ণের। শ্রীশ্রীমায়ের মুখমণ্ডল তখন ঈষৎ রঞ্জিত—

স্বগীয় জ্যোতিতে পরিব্যাপ্ত—একই অঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহামিলন—মুখের হাসিটি অম্লান—স্নেহকরুণার বিগলিত মহীয়সী মাতৃমূর্তি!

আমার অন্তর—পুলকিত, স্তব্ধ ও ধন্য! মধুর মাতৃমূর্তি হেরিয়া আজিকে গুরুপূর্ণিমার প্রভাতে—ধন্য হইল অন্তর মম, পূর্ণ হইল মাতৃকৃপাতে!

মাগো! তোমার এই অপূর্ব্ব মহীয়সী মাতৃমূর্তি—শুধু হৃদয়েই ধারণ করে রেখে দেওয়া যায়; এর বর্ণনার প্রকাশ—আমার মত অজ্ঞানের কি সাধ্য আছে রূপ দেওয়ার—তবুও, তোমার অনন্ত কৃপাতেই অনন্য-শরণে শরণ নিলাম!

চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছিল—তারই ভেতর দিয়ে শ্রীশ্রীমা যেন অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়ে দর্শন দান করলেন।

এতদিন পরে দিলে কি গো মা মোরে দরশন?
দিন রাত্রি সয়েছি কত তোমার অদর্শন।

একটু পরেই মাতৃমন্ত্রে তিনবার শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হোল। তারপর আরম্ভ হোল মাতৃপ্রণাম—সবাই সারিবদ্ধ দাঁড়ানো হোল। কোন হুড়াহুড়ি নেই—শান্ত ও শান্তির পরিবেশে—হৃদয়ে মহাভাব নিয়ে সবাই সুশৃঙ্খলার সাথে একে একে এগিয়ে যেতে লাগলেন—মায়ের চরণে প্রণত হবার জন্যে। দেখলাম সবাই চরণ স্পর্শ করেই প্রণাম কোরছেন—বিশেষ দিনের জন্যে এই ব্যবস্থা, পরে শুনেছি। আস্তে আস্তে আমার সময় হোল। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করে তার পরে মাথা রাখলাম। মনে মনে ডাকলাম—মা, মাগো, মা—মা তখন আশীর্ব্বাদিনী মাতৃরূপে সংস্থিতা। শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্পর্শমাত্রই সমস্ত দেহে যেন মাতৃস্নেহের তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হোল—মনে হোল—ছোট্ট দু'টি দেবীচরণে মাথা রেখে যুগ-যুগান্তর মা মা বলে ডাকি। ছোট্ট দুটি রাঙা চরণ অতি নরম ও মসৃণ—এই দুর্লভ চরণযুগল কি মানুষে সম্ভব? তার পরেও মায়ের শ্রীচরণে কতবার মাথা রেখেছি—ঠিক একই ভাব মনে হয়েছে। একটু বাদেই সরে এলাম—তখনও যে অনেকে বাকী রয়েছেন মায়ের চরণে প্রণাম জানাতে।

অভিভূত আমি আস্তে আস্তে নীচে নেমে দোতালার হল ঘরে এসে বোসলাম। সবাই শ্রীশ্রীশোভামায়ের জয় দিচ্ছিলেন—আমার কণ্ঠ স্তব্ধ ছিল। আমি পুরোপুরি তখনও সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলাম না ; কারণ, এইরকম পরিবেশে আমি এই প্রথম ও নূতন। কিছুক্ষণ বাদে মা নীচে নেমে এলেন ক্ষণিক বিশ্রামের জন্যে। খানিকক্ষণ বাদেই সাধারণ একখানা সূতির নক্সাপাড় শাড়ী পরে নিজের ঘরের দরজার কাছে চেয়ারে বসলেন।

একটু এগিয়ে মায়ের কাছে যেয়ে বোসলাম। মা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—এসেছ! নীলমণিকে দেখেছ? তোমার স্বপ্নের গোপালের সাথে মিল হয়েছে কিনা দেখতো!

আমি কিন্তু নীলমণি গোপালের কথা ভুলে বসে আছি ; সন্তানের বাসনা পূর্ণ করতে এত ব্যস্ততার মধ্যেও মনে আছে আমার গোপালদর্শনের স্বপ্নের কথা!

সমস্ত বিগ্রহ-মূর্ত্তির সাথে নীলমণিজী বসে রয়েছেন আমার দিকে পিট্-পিট্ করে তাকিয়ে। মন বলে উঠলো—এই তো আমার গোপাল—এই তো খুঁজে পেয়েছি মায়ের কৃপাতে আমার গোপালকে।

মাগো! কত রূপেই তুমি দেখা দেবে মা! যুগে যুগে তুমি তোমার সন্তানদের কত ভাবেই ছলনা করেছ, বিভ্রান্ত করেছ—আবার পরম করুণাময়ী মাতৃরূপে তাদের কোলে টেনে নিয়েছ!

মা সবাইকে প্রসাদ নিতে যেতে বললেন। আমাকে বললেন—'তুমি ও যাও, প্রসাদ নাও।' আমি নূতন বলে মা আমায় কৃপা করলেন। মনে আছে প্রসাদ পেলাম—খিচুড়ী, লাব্ড়া তরকারী, আলুরদম, চাট্নী ও পায়েস—যে যত চাও তত প্রসাদ পাও—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার—অপূর্ণতা সেখানে কিছু নেই।

সবাই শ্রীশ্রীমায়ের জয় দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ কোরছেন। চতুর্দিক থেকেই যেন আনন্দের ধ্বনি উঠছে। কারো কোন ক্লান্তি নেই—শুধু আনন্দের জোয়ার

বয়ে যাচ্ছে। প্রসাদ নিয়ে নীচে নেমে এসে দেখি হল ঘরে মা নেই—শুনলাম, মা নীচে নেমে গেছেন, যারা রান্নার কাজে ব্যস্ত আছেন তাদের কাছে—তাদের দর্শন দিতে—তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিতে; মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে তাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীমা উপরে উঠে এসে আবার আসন গ্রহণ করলেন—সন্ত-আশ্রমে প্রতিটি আনাচে কানাচে যেন—মা-মা নামের রব উঠেছে।

শ্রীশ্রীমা সবার কথা শুনছেন—প্রতিজনের প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছেন। প্রতিটি প্রশ্নেরও সমস্যার ছোট ছোট সহজ সরল উত্তরে মনের ক্ষুধা মিটিয়ে তৃপ্তিতে ভরে দিচ্ছিলেন। এক এক জনের বারবার এক প্রশ্ন সত্ত্বেও মায়ের মুখে ছিল না কোন বিরক্তির আভাস—পরম যত্নে তাকে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মায়ের এই ভাবটি আমার মনে প্রাণে গভীর ভাবে সাড়া জাগাচ্ছিল—মায়ের কাছে সবাই সমান—কোন তফাৎ নেই।

মাগো! তোমার সহজ সরল রূপে, হাতটি বাড়িয়ে তুমি সবাইকে কাছে টেনে নিচ্ছ, তোমার অপরিসীম বক্ষের মাঝে—তোমার স্নেহের সুধার ভাণ্ডটি নিঃশেষে উজাড় করে! অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত সন্তানেরা পূজ্যপাদ গুরুদেবদের প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল করে নগর-পরিক্রমায় বের হলেন, নাম-সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হয়ে।

প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে লুট দেবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন আশ্রমের আঙ্গিনায়। আশ্রমের দ্বারপ্রান্তে যখন সবাই ফিরে এলেন তখনও সবাই নামে মাতোয়ারা—শ্রীশ্রীমায়ের হাতের লুটের বাতাসার অপেক্ষায় উদগ্রীব। মা লুট দিতেই গানের ধ্বনি উঠলো—"মা দিতেছেন লুটের বাহার, লুটিয়ে নেরে তোরা; ছড়িয়ে পড়ে ফুলবাতাসা, সঙ্গে আশীষ-ধারা।"

উৎসাহে, আনন্দে, মাতোয়ারা সন্তানগণ মায়ের স্বহস্তের দান বাতাসা-প্রসাদ লুটে নেবার জন্যে আত্মহারা হয়ে পড়লেন—গোলাপ গাছের কাঁটায় অঙ্গ ছড়ে গেলো, তবুও তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, শ্রীশ্রীমায়ের হাতের বিশেষ

প্রসাদ চাই-ই চাই। আগে তো কুড়িয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে, এই ভাব। নিবিষ্ট মনে দেখছিলাম আর মায়ের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম—মাগো এই অসীম আকুলতা আমার হৃদয়ে দিও মা, দিও মা সব সংশয় ঘুচিয়ে, সংকোচের আবরণ অপসারিত করে—আমাকে তোমার করে নাও মা, নাও!

সেবিকারূপে মায়ের দর্শনও পেলাম। সন্তানদের জন্যে আকুল উদগ্রীব; কাঁটার ব্যথা যারা পেয়েছিলেন, নিজহাতে তাদের ক্ষতস্থানে ডেটল লাগিয়ে দিলেন—শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ প্রসাদে কাঁটার খোঁচাও ধন্য হয়ে উঠলো।

শ্রীশ্রীমায়ের আতিথেয়তার ও কোন ত্রুটি ছিলো না। বিকালে আমার বাড়ী থেকে যারা এসেছিলেন, তাদের ফল, মিষ্টি ও মিষ্টান্ন প্রসাদে আপ্যায়িত করলেন। আমার আশ্রমিকা বোনেরা এ ব্যাপারে মায়ের দক্ষিণ হস্ত—ধন্য তোমরা, শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানের পরিচয়ই তোমাদের উপযুক্ত পরিচয়!

শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সেদিনকার মতন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম কোলকাতা ফিরবার জন্যে—আনন্দের উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে নূতন আনন্দ, নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলাম।

মনে মনে বহুদিনের বাসনা-কামনা ছিলো—মৃন্ময়ী মাগো! চিন্ময়ী রূপে দেখা দে মোরে। দেখতে বড় সাধ জাগে—দেখা দে মোরে অন্তরে!

মাগো! সেই কি তুমি এলে আমার সুপ্ত মনের বাসনা-কামনা পূর্ণ করতে চিন্ময়ী রূপে? দৃঢ় ভঙ্গিমায় আপনরূপে সন্তান-জননী হয়ে?

চিন্ময়ী মাগো! মায়ের চরণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই—নিজের সত্ত্বা না রেখে—সেই কামনাই আমার অন্তরে ব্যাকুলভাবে জাগিয়ে দিও মা—তোমার চরণে এই প্রার্থনা!

৪

মন শুধু ভেবেই চলে—কি করে মায়ের অনন্ত মহিমা আমি প্রকাশ করবো, তার উপযুক্ত ভাষা কোথায় পাবো!—শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা-আশিষের কথা চিন্তার

মধ্যে জড়িয়ে মন ডুবে যায় আনন্দলোকে—মনের গহনে ডুবে ডুবে সেই চিন্তাধারার মাঝেই 'মাকে' পাই কাছে, অতি আপনার করে—সেই ভাবটুকু আমি কি করে জানাবো, প্রকাশ করবো, লেখনীর মাধ্যমে—নিজেই জানিনা যে! আমি জানি, সবকিছু লিখবার ক্ষমতা আমার নেই—তবুও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা-আশীর্বাদ ভিক্ষা করে আমার লেখনী কাজ করবে—মায়ের মাধ্যমে—মায়ের শরণ নিয়ে!

শ্রীশ্রীশোভা মায়ের বিশেষ কৃপা-আশীষের কথা—এই জীবনে যা লাভ করেছি—জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে, অন্তরে, বাহিরে, মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত পরম সম্পদ—মাতৃপ্রসাদ—সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে মাতৃ-আনন্দে বিভোর হতে চাই!

সবকিছু ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের আছে অক্ষমতা—দিন তারিখ আমার মনে নেই—তত্ত্ব, দর্শন কিছুই জানি না—শুধু অন্তরে রয়েছে ভাবটুকু—মায়ের আশীর্বাদ হলেই তা প্রকাশ করতে সক্ষম হবো—সহজ সরলভাবে মাতৃনাম-গানে!

কল্যাণী থেকে ফিরে এলাম অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার সংগ্রহ করে। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে অন্তরের যোগাযোগ ঘটলেও বাইরের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারিনি, মনের মাঝে একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব রয়ে গিয়েছিল—বিশেষ একটি ব্যাপারে—যে সমস্যার সমাধান মাই আমাকে পরে করে দিয়েছেন।

গুরু-পূর্ণিমার পরে বেনারস রওনা হবার আগে মা এসেছেন সিঁথির সন্ত-আশ্রমে—জানতে পারলাম। শ্রীশ্রীমায়ের সব আশ্রমই তাঁর পরম পূজ্য গুরুদেব মহাসাধক শ্রীশ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের নামে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের শ্রীশ্রীমা গুরুর মানস-কন্যা। গুরুর প্রতি তাঁর ভাবটি অনবদ্য ও অসীম অন্তরঙ্গতায় অভিভূত; প্রতিটি কাজে ও কথায় গুরুর মহান্ ভাবটি তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। নিজের সবকিছু সত্তাই তিনি গুরুর মাঝে বিলীন করে দিয়ে একাত্ম হয়ে রয়েছেন—প্রতিটি চিন্তায়, ভাবধারায়, দর্শনে, স্পর্শনে, রূপে, রসে—পরম গুরুর ভাবে গুরুময়, আনন্দময়!

যে ব্যাপারটিতে মায়ের সাথে আমার দূরত্ব রয়ে গিয়েছিলো সেটা জানাবার তীব্র ইচ্ছায় সিঁথির আশ্রমের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। মা যখন ডাক দেন তখন কোন বাধাই বাধা নয়—অজানা অচেনা পথের হদিসও ঠিকমত মিলে যায়। আশ্রমে গিয়ে যখন পৌঁছালাম, শুনলাম, মা বিশ্রাম করছেন। তখন বেলা ৯-৫০ হবে। তার আগের দিন সারাদিন সন্তানদের নিয়ে বাইরে যাওয়াতে তিনি ক্লান্ত আছেন।

দোতালাতে উঠেই ডান ধারে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মন্দির—কল্যাণীরই অনুরূপ। তার সামনে রয়েছে লম্বা দরদালান। আমি সেখানে বসেই মায়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সে সময় মনে আমার দারুণ দ্বন্দ্ব চলছে—অখণ্ড বিশ্বাস কারো ওপর থেকে যেয়ে যদি মনে অবিশ্বাসের ছায়া নামে, তখন মনে যে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয় বিশ্বাস হারানোর ব্যথাতে—একমাত্র ভুক্তভোগীই তা বুঝতে পারবেন। এক এক সময় মনে হয় বিশ্বাস করে প্রাণ দেওয়া ভাল, অবিশ্বাসের বিষের দাহে দগ্ধ না হয়ে—এই রকম অবস্থা তখন চলছিলো। এই ব্যাপারটিই মায়ের সাথে দূরত্ব এনে দিচ্ছিল—যতক্ষণ না তাঁর চরণে সমস্ত নিবেদন করতে পারি।

আমি একজন গৃহীযোগীর 'পরে গভীর আস্থা সমর্পণ করেছিলাম ; যখন ক্রমেই দেখতে পেলাম তাঁর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মিথ্যা ছলনার আশ্রয় আছে —আধ্যাত্মিকতার চেয়ে অলৌকিকত্বের পরেই প্রভাব বেশী—তখন আমার মন অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো, তখনই আমি আমার মায়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম "মাগো তুমি আমাকে হাতে ধরে ঠিক পথে নিয়ে চল, আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কিছুই বুঝতে পারছি না"। মা তখন মনে হয়, দূরে দাঁড়িয়ে আমার আকুলতা দেখছিলেন ; আমার ব্যাকুলতায় মা সত্যিই প্রদীপটি ধরে আলো দেখাতে এগিয়ে এলেন। সেই সময়-বেনারসের সন্ত-আশ্রম থেকে একটা চিঠি পেয়ে যেটুকু মনে সংশয়ের দোলা ছিল স্পষ্ট আলোর মতন মানসচক্ষে স্বচ্ছ হয়ে উঠলো—'জয় মা' !

আমি মনের গভীরে বসে সেই চিন্তাই করছিলাম—এমনি সময় মা বিশ্রাম-কক্ষ থেকে বেরিয়ে তাঁর আসনটিতে বসলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালাম, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—অল্প ক্লান্ত মায়ের মুখশ্রী যে কি সুন্দরই লাগছে! সত্যিই মায়ের শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন যেন আপনা থেকেই মনে মিলিয়ে যায়, মায়ের মুখের প্রশান্তিই যেন সব প্রশ্নের, সব ব্যথার উত্তর। কি কি কথা মাকে বলেছিলাম আজ আমার স্পষ্ট মনে নেই, আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন—"সন্ন্যাস-জীবনে মিথ্যার আশ্রয়—গুরু যদি শিষ্যকে ঠিক পথে পরিচালিত না করে ভুল পথে নিয়ে যান—সে পরম অপরাধ তাঁরই—শিষ্যের নয় জানবে।"

মাকে একটা কথা আরো জিজ্ঞাসা করেছিলাম— "মাগো কোথাও গেলে যদি সত্যিকারের মন না ভরে, তার কি আর কোথাও যাবার উপায় নেই?"

শ্রীশ্রীমা আমার মনের কথাটি ঠিক বুঝে নিয়েই উত্তর দিলেন—অতি মিষ্ট ভাষায় ও তদ্‌গতচিত্তে—"আমার গুরুদেব বলতেন—মধুকরেরা তো ফুলে ফুলে বসে মধু আহরণ করবার জন্যে, এক ফুলে মধু না পেলে আর এক ফুলে উড়ে যেয়ে বসে, একবার মধু যেখানে পায় সেখানেই নিবিষ্ট হয়ে যায়। মধু না পেলে, মন না ভরলে, স্থান পরিবর্ত্তনে কোন দোষ হয় না। তবে মধু একবার যদি পাও—মন যদি ভরে—তবে সেখানেই নিবিষ্ট হয়ে যেতে হবে—মধুকরের মতন!"

এখানেও দেখলাম গুরুর প্রতি অবিচল নিষ্ঠার সুরটি শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হোল অসীম শ্রদ্ধার সাথে।

মায়ের কণ্ঠস্বরে ও বাচনভঙ্গিমার স্নেহের ও সান্ত্বনার সুরে আমার অন্তরে অপরূপ ভাবের সৃষ্টি করে, হৃদয় তোলপাড় করে, চোখে জল এনে দিল, মনে এনে দিল গভীর প্রশান্তি—দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন এক নিমেষেই ঘুচে গেলো। মনে হোল—সব বিভেদ মিটে যেয়ে মায়ের সাথে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি—আমার এই দেহটা যেন শূন্য, খালি মনে হতে লাগলো মায়ের আশীর্ব্বাদে! স্তব্ধ হয়ে বেশ

কিছুক্ষণ বসে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে সেদিনের মতন উঠে এলাম। সাথে নিয়ে এলাম অপার আনন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ ও করুণার অমৃত-স্মৃতি।

মাগো! মনের অব্যক্তভাব ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। স্মৃতির আলোড়নে, মধুর আবেশে, মনোজগতে কথা ও লেখা চলে অবিরাম—কত কথার আদান-প্রদান, কত মধুর অমৃত-স্মৃতি, মনের লেখনীতে লেখা হয়ে যায় নিভৃত সযতনে; কিন্তু, তার বাইরের প্রকাশ কণামাত্র হ'তে পারে—কেবল তোমারি কৃপাতে। তাই তো, তোমার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাই—কৃপা করে প্রকাশিত হও লেখনীর মাধ্যমে—সুপ্ত বাসনায় যা রয়েছে মনের গভীরে। তোমার শ্রীচরণে দাও মোরে পূর্ণ শরণাগতি।

৫

মাগো! স্মৃতির কত পৃষ্ঠাই তো উল্টে যাচ্ছি আপনার অন্তরে—দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে—জীবনের সময় বহে যাচ্ছে। লেখনীতে সে আনন্দের ভাষা প্রকাশের অক্ষমতার গ্লানি নেই—পরম নিশ্চিন্ততায় চিন্তা-ভাবনার মাঝে একটি চিন্তার স্মৃতি নিয়েই মন যে তোমার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, বেগে ধেয়ে চলে পরমানন্দে!

সেই অনাবিল স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশে তোমাতে আমাতে পরম মিলনে মন গভীরে মগ্ন হয়ে যায়। সেখানে বিরহের কোন ব্যথা নেই—মায়ের কোলে সন্তান আনন্দের আবেশে বিভোর!

গভীর আনন্দ নিয়ে মন কত কথাই বলতে চায়—!

মাগো! সীমার মাঝে তুমি অসীম। তোমার অসীমত্বের, তোমার বিরাটত্বের মাপকাঠি তুমি নিজেই যে মা—তোমার বাণী দিয়েই তোমার কথা তাই বলি—'ক্ষুদ্র শিশু যেমন চাঁদ ধরতে চায়, আমিও যে চাই তোমার কৃপা-কণা লিখতে, ছোট্ট শিশুটির মতন হয়ে। আমার দোষ-ত্রুটি-ধৃষ্টতা শুধু

তোমার কাছেই শোভা পায়; তুমি যে স্নেহময়ী জননী, পরম আশ্বাসের সাথে দিয়েছ পরম নির্ভয় আশ্রয়। সহাস্যে সব তুমি ক্ষমা করে নিয়ে, ভুল ত্রুটির মাঝেই আমাদের ঠিক পথে চালিত করে নেবে—আমাদের সকল প্রচেষ্টার পেছনে থাকবে জানি তোমার কৃপার প্রেরণা। তাই তো শিশুর মতন প্রাণভরে তোমায় বার বার ডাকি, বার বার ডাকতে চাই—মা, মাগো, মা আমার বলে।

শ্রীশ্রীমায়ের বেণারস যাবার দিন এগিয়ে এলো। যথাসময়ে মায়ের সাথে ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশন থেকে কাউকে বিদায় দিতে মন চায় না বলে মাকে আগেই বলেছিলাম ট্রেন ছাড়বার আগে আমি বাড়ীতে ফিরে যাবো; কিন্তু, অদ্ভুত—মনের আকর্ষণে ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত থেকে গেলাম—সেজন্যে পেলাম আমার চিন্তার অতিরিক্ত মায়ের প্রসাদ!

"শ্রীশ্রীশোভা মাতাজী কী জয়"—মায়ের জয় দিতে দিতে সবাই মায়ের নির্দিষ্ট কামরার দিকে এগিয়ে এলেন।—মা ট্রেনে উঠবার আগে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করলাম—শ্রীচরণের পরশ নিয়ে নিজেকে ধন্য করলাম। আমি নীরবে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম—আর শ্রীশ্রীমায়ের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের বিয়োগ-ব্যথায় মনটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিলো। দূরে দাঁড়িয়ে মায়ের দর্শন পাচ্ছিলাম—শ্রীশ্রীমা নিজের কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন—সবাই লাইন করে প্রণাম করছেন, মায়ের চরণে মাথা রেখে। মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একটি সুশ্রী লাবণ্যময়ী তরুণী—তিনি হঠাৎ আমাকে হাতের ইশারায় কাছে যেতে ডাকলেন। মনে হল, এর মধ্যে মায়ের আদেশ নিহিত রয়েছে; এগিয়ে আসতেই বললেন—মাকে প্রণাম করুন। মনের তখনকার ভাব বোঝাতে অপারগ, মায়ের চরণে লুটিয়ে দিয়ে মনে মনে প্রার্থনা জানালাম—আমাকে উজাড় করে মাগো—আমার আমিত্বের সবটুকু নাও! তোমার কৃপা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। প্রণাম করে উঠতেই শ্রীশ্রীমা আমার হাত একটু আলতো করে ছুঁয়ে দিলেন; মায়ের পরশে মনে হল আমার সমস্ত শরীরে স্বর্গীয়

আনন্দের শিহরণ প্রবাহিত হল। শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি মৃদু হাসির সূক্ষ্ম আভাস ও আশ্বাসের ছোঁয়া। মনে হল—অন্তর্যামী মা, অন্তরের কথাটি ঠিক বুঝে নিয়েছেন।

আস্তে আস্তে সরীসৃপ-গতিতে ট্রেনটি ছেড়ে গেলো—শ্রীমায়ের কামরাটি দূর হতে দূরে চলে যেতে লাগল। মা হাত নেড়ে সবাইকে আশীষ-বিদায় জানাচ্ছিলেন—মনে হচ্ছিল, সন্তানদের ছেড়ে যেতে মায়ের চোখ ছল ছল করে উঠ্‌ছে। অপস্রিয়মান ট্রেনটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ; মনে সংমিশ্রিত ভাবের সমাবেশ হচ্ছিল—একদিকে মাতৃলাভের আনন্দ, আর একদিকে মাতৃস্নিগ্ধ -সান্নিধ্যের বিয়োগ-বেদনা!

শুভক্ষণ মানুষের জীবনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না , কিন্তু, বিশেষ কৃপাতে শুভমুহূর্ত্ত কারো জীবনে যদি একবার আসে—সে মুহূর্ত্ত কখনও হারিয়ে যায় না বা যেতে পারে না।

মাগো, তোমার বাণীর মাঝেই রয়েছে মোদের জীবনের পরম নির্ভরতা ও জীবনের চলার পথের পাথেয়। তোমার বাণী এখানে তাই তুলে ধরলাম— "তোমরা ছাড়া আমি নই—আমি ছাড়া তোমরা নও ; আমরা পরস্পর পরস্পরের মাঝে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছি ; এর বিচ্ছেদ নাই—মিলন নাই। কারণ, মিলনের প্রশ্ন ওঠে বিচ্ছেদের ভয়ে—যেখানে বিচ্ছেদ নাই সেখানে মিলনের প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের সম্বন্ধ যে মিলন-বিচ্ছেদের বহু উর্দ্ধে—তাই তোমরা অনুভব করবার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর।"

মাগো! আশীর্ব্বাদ কর—কৃপা কর—তোমার বাণীর একটি রূপও যেন আমরা আমাদের জীবনে নিয়োজিত করতে পারি।

আনন্দ ও বিচ্ছেদের মাঝে শ্রীশ্রীশোভা মায়ের মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করে বাড়ী ফিরে এলাম—মনে অভূতপূর্ব্ব পরম আনন্দ বহন করে।

৬

শ্রীশ্রীমায়ের কথা লিখতে যেয়ে কত কথাই মনে ভিড় করে আসছে—কোন্‌টা আগে লিখবো, কোন্‌টা পরে লিখবো, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ভেবেই পাচ্ছি না। নিজের অক্ষমতা প্রতি মুহূর্তে বহন করছি। আমি মায়ের কথা প্রকাশের যোগ্যা কি অযোগ্যা—সে শুধু মা জানেন। তাঁর উপরেই পরম নির্ভর। শুধু জানি—জীবনের প্রতিটি সূক্ষ্ম অনুভূতির মাঝে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা-পরশ আমায় উদ্বেলিত করে পূর্ণ করে রাখে; শুধু জানি—মাগো! তুমি আছো, তুমি রয়েছো—এই পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণার মাঝে, রূপে রসে গন্ধে—আনন্দের মাঝে আনন্দে—সর্বস্থানে—সর্ব্ব পরিস্থিতির মাঝে তুমি রয়েছো, তুমিই সবার পরম ভরসা—চির অভয়; তোমাকে জানাই আমার আনন্দ ও অন্তরের অন্তরতম নিবেদন।

১৯৭০ সালের শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার পরে চিন্ময়ী মাতৃরূপে মা আবার কোলকাতায় এলেন। সেবার বেনারস সন্ত-আশ্রমে মূর্তি গড়ে বিশেষভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের আগামী পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষ্যে। সেবার মা বেনারস এক্সপ্রেসে দুপুর বেলা রওনা হয়ে যাবেন—ষ্টেশনে গেলাম মায়ের সাথে দেখা করবার জন্যে ও তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে নিবেদিত করতে। সেখানে ব্রহ্মচারিণী শ্রদ্ধাদেবী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ-চিঠি ও উৎসব-তালিকা-সূচী দিয়ে আমাকে সেই সময় বেনারসে উপস্থিত থাকবার জন্যে আহ্বান করলেন। আমি বললাম—"মা যদি নিয়ে যান, তবেই তো যেতে পারবো—তা না হ'লে কি করে যাবো?" শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম জানাতে, বললেন—

"তুমি বেনারস আসতে চেষ্টা কোরো।" আমি আবার বললাম—"তুমি আমায় নিয়ে যেও, মাগো!" শ্রীশ্রীমা উত্তরে বললেন—"তুমি চেষ্টা কোরো, আমার চেষ্টার সাথে তোমার চেষ্টাও মিলিয়ে দিও।"

তখনই মনে হল—মা যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই বেনারস যাওয়া হবে। সংসারে নানা বিপর্য্যয় থাকাতে সেবার মায়ের কাছে কল্যাণী যেতে পারিনি।

বিদায়ের ক্ষণ শ্রীশ্রীমা ভরে দিয়ে গেলেন তাঁর শুভাশীষ দিয়ে। চোখের জলে —মা-মা-ময় প্রাণের আকৃতির মাঝে—মায়ের সন্তানেরা বিদায় দিলেন মাকে।

জয় মা—তোমারই জয়! যত পাই তত কাছে চাই—সেই তো তোমার বিজয়!

৭

আমার ঠিক মনে নেই—ডিসেম্বার মাসের শেষ দিকেই—১৯৭০ সালে, শ্রীশ্রীমা বোধ হয় বেনারস ফিরে গেলেন। উৎসব-সূচী খুলে দেখলাম—১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সাল, ১লা ফাল্গুন ১৩৭৭ বাংলা সন—উৎসবের শুভারম্ভ। ১৫ দিন ব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপিত হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর সব সময় মনে জাগছে—মা বলেছেন—আসতে চেষ্টা কোরো।

সংসারের নানা পরিস্থিতিতে নানা বাধা। তার মাঝে রয়েছে মায়ার খেলা—তারই বন্ধনে জর্জ্জরিত। মন তবুও কিছুতেই মানছে না বা মানতে চাইছে না।

সবার মতামত নিতে গেলে যাবার সুযোগই মিলবে না—এদিকে মনে হচ্ছে দেরী করাও চলবে না। মায়ের কাছে প্রার্থনা করে সাহসী হয়ে উঠলাম। ভিতরে ভিতরে ঠিক করেছি—বেনারসে যেয়ে আমার এক আত্মীয়ের খালি বাড়ীতে থাকবো। কারণ, তখন আশ্রম ও তার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিলো না—বিশেষ করে উৎসবের সময়। রেলের টিকিট করা হয় নি। 'জয় মা' বলে বেরিয়ে পড়লাম নিজেই—ষ্টেশনে টিকিট কাটবার জন্যে। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছি, বেনারস যাবার জন্যে টিকিট কাটতে যাচ্ছি শুনে বললেন—"তুমি পাগল নাকি! এত অল্প সময়ের মধ্যে কি রিজারভেশন পাওয়া যায়?—টিকিট তোমার জন্যে কেউ

হাতে করে বসে থাকবে নাকি ভেবেছ!" আমি শান্ত স্বরে উত্তর দিলাম—মায়ের উপর নির্ভর করে—"দেখি তো চেষ্টা করে, রিজারভেশন পেলে যাব—না পেলে যাওয়া হবে না।"

মাগো! তোমার কৃপার আমরা কি ই বা বুঝি? তোমার নাম স্মরণ ক'রে হাওড়া ষ্টেশনে গেলাম। ভিড়ে ভিড়—তার পর টিকিট করবার অনভিজ্ঞতা। তবুও মায়ের শরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমাকে কাউণ্টার থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কোথায় যাবেন মা?" ভরসা করে এগিয়ে এসে বললাম—"বেনারস যাবো, একটা লোয়ার বার্থ্ হবে?" তিনি চার্ট্ দেখে বললেন—"আপনি যদি আজই তুন্ এক্সপ্রেসে যেতে পারেন তবে লেডীজ্এ একটা লোয়ার বার্থ্ হতে পারে।" আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেতেই ভদ্রলোক সব বন্দোবস্ত করে টিকিট দিয়ে দিলেন।

মাগো! তোমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে, তোমার কৃপা ছাড়া—অভাবনীয়রূপে এইভাবে টিকিট পাওয়া কি সম্ভব ছিলো? জয় মা জয়! আমার কাতর প্রার্থনায় তুমি বেনারস বসেও অযাচিত কৃপায় হৃদয় ভরিয়ে, মনোগত ইচ্ছা পূরণ করে দিলে!

তারপরও কতবার দেখেছি—কল্যাণীতে যাবার সময় ও বেনারস যাবার সময় কিভাবে যে রিজারভেশন পেয়েছি ও ট্রেনের সময় পার ক'রে ষ্টেশনে পৌছানো সত্ত্বেও যে কিভাবে ট্রেন পেয়েছি ও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যেয়ে পৌছেচি, সে সব কারণ খুঁজতে গেলে অবাক বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমায়ের এই কৃপা-আশিস্ যারা পেয়েছেন আমার মনের কথাটির সাথে নিশ্চয়ই তারা পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

তখনও তো জানিনা আরও কত অপার, বিস্ময় মায়ের এই সন্তানটির জন্যে কৃপা-আশীষের মাধ্যমে জমা করে রেখে দিয়ে, অন্তরের অন্তরে মহামাতৃভাবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন!

স্নুন্দর স্নুচারুরূপে বন্দোবস্ত করে মা আমায় বেনারস নিয়ে গেলেন।

রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না—শুধু রেখেছি মায়ের উপর পূর্ণ ভরসা—মা গো, মা! তুমিই জানো—সব দায়িত্বই যে তোমার!

মায়ের আশীর্ব্বাদে কোন কিছুরই ত্রুটী হোল না, সাহায্য-হাত এগিয়ে এলো—এমন কি, রিক্সাওয়ালার মাঝে ও যেন পেলাম মায়ের অভয়বাণী। রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করে আমাকে নিয়ে গেল আমার থাকবার জায়গায়—সেখান থেকে মাতৃধামে সন্তনগর সন্ত-আশ্রমে।

কি আনন্দ, কি আনন্দ! শেষ পর্য্যন্ত মায়ের কাছে আসতে পেরেছি তাঁরই করুণা-কৃপাতে! আশ্রমে প্রথমে ঢুকেই দেখা হোল আমার স্নেহের বোন ব্রহ্মচারিণী কৃষ্ণা দেবীর সাথে। ও যে কিভাবে আমাকে একবারেই চিনে নিলে বুঝতে পারলাম না। কারণ, কৃষ্ণার সাথে আমার কোলকাতায় দেখা হয়নি। আমাকে দেখেই বললে—"আপনি নিশ্চয়ই রেণুকাদি?" আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম—"আমাকে কি করে চিন্‌লে ভাই?" মৃদু হেসে বল্লে—"মায়ের কাছ থেকে।"

আমাকে মাতৃধামে নিয়ে এলো—শ্রীশ্রীমা তখন বিশ্রাম কোরছিলেন, কারণ, তখন ছিল বেলা আড়াইটা। উপরে 'স্থ'মণির সাথে দেখা হোল—আর দেখা হোল আমার কলেজ-জীবনের পরিচিতা শ্রীমতী বীণা দেবের সাথে। শুনলাম বীণা বহুদিন থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিতা ও মায়ের ভক্ত।

তখনও সবার সাথে ভাল করে পরিচয় হয় নাই—পরম পূজনীয়া দি'মার সাথে ও আমার বিশেষ পরিচয় ছিলো না। তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ-ভালবাসার ও অক্লান্ত সেবাপরায়ণ মনের পরিচয় পেলাম বেনারস আশ্রমে এসে।

ট্রেন থেকে নেমে মনের প্রেরণায়—খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আশ্রমে আসবার পর বোনেরা বার বার আমাকে প্রসাদ নেবার কথা বলা সত্ত্বেও নিতে পারলাম না, কারণ শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে ও তাঁকে দর্শন ন করে কিছু করতে মন চাইছিলো না।

বেলা ৩টা নাগাদ শ্রীশ্রীমা ঘর থেকে বেরিয়ে মাতৃধামে আসতেই তাঁর চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোরলাম।

"কি গো এসেছ?"—মায়ের কথাতে ও প্রাণোচ্ছল হাসিতে মনে হোল, আমার বেনারস আসা সার্থক হোল। মনে মনে বোল্লাম—"মাগো! তোমার অজানিত কিছু নেই—জেনেও অজানার ভান করে কেন আমার পরীক্ষা কোরছ?"

শ্রীশ্রীমাকে আমার বেনারস আসবার ঘটনা একটু জানালাম।

উৎসব সুরু হবার একদিন বাকী ছিলো। কোথায় আছি—মা জেনে নিলেন ও আমাকে রোজ সকালে আশ্রমে আসতে ও প্রসাদ গ্রহণ করতে বল্লেন। আমি সানন্দে নীচে নেমে এলাম—মায়ের চরণে প্রণতি জানিয়ে। আশ্রমিকা বোনেদের তত্ত্বাবধানে প্রসাদ গ্রহণ করে ফিরে এলাম।

মন আনন্দে, সুগন্ধে পরিপূর্ণ—অনুপায়ের উপায় তুমি যে মা!

বড় বাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেউ ছিলো না—কিন্তু, কই আমার তো মনে হোলনা একটুও যে আমি একা রয়েছি। মনে হোল—শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতির পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে তিনি যে আমার চারপাশেই রয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের অনন্তরূপ আমার অন্তরে ও বাহিরে প্রতিভাত হোতে লাগলো। যে মাকে পাবার জন্যে হৃদয় আকুল—অন্তর ব্যাকুল—চোখের জলে কেঁদে কেঁদে ফিরেছি—তিনিই কি চিন্ময়ীরূপে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, মধুর মাতৃরূপে?

অসহায় মা আমি—তোমার চির আশ্রয়ে রেখো মা আমারে—তোমারই আশ্রিতা করে—। তোমার চরণে রাখলাম অন্তরের অনন্ত প্রণাম।

৮

উৎসবে মায়ের আশিস, কৃপা ও লীলা-মাধুরী

(ক)

উৎসব সমাগত—সন্ত-আশ্রম অতি মনোহর উৎসব-সাজে সজ্জিত। ব্রজধাম বিজলী আলোকে সুসজ্জিত। মন্দিরোপরি—মন্দির চূড়ার "ওঁ" প্রদীপ্ত ভঙ্গিমায় আলোক-মালায় বিভূষিত হয়ে ওঁকারধ্বনি ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে বাতাসে—পুণ্য, শুভ-মুহূর্ত্তটিকে আপনার গভীর নিনাদে পূর্ণ করে দেবে বলে। মন্দিরের আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ, দেব-দেবীর মূর্ত্তি, শ্রীশ্রীপরমদাদাগুরুজী মহারাজের প্রতিকৃতি ও শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের মর্ম্মর-মূর্ত্তি—অতি মনোমুগ্ধকর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে সচলরূপে অধিষ্ঠিত। ধূপ-ধূনা, ফুল, চন্দন ও তুলসীর সুগন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তরে অপূর্ব্ব অপার্থিব কোন এক শান্ত সমাহিত স্বর্গের পরিবেশ রচিত হয়েছে।

মাতৃধাম সেজেছে ফুল, মালা ও নানারূপ মাঙ্গলিক আল্‌পনায় অপরূপ সাজে।

আশ্রমের তরুলতাও উৎসবের আনন্দ-হিল্লোলে হিল্লোলিত—মনের আনন্দে, প্রাণের বন্দনায়, মায়ের চরণে দিতে অঞ্জলি ডালি!

বড় সুন্দর নামকরণ করেছেন শ্রীশ্রীমা সন্ত-আশ্রমের প্রতিটি বিভাগের। নূতনত্বে ও বৈচিত্রে ভরা—যার মাঝে আছে গভীর অর্থ নিহিত।

আশ্রমে ঢুকতেই প্রধান রাস্তার নাম রেখেছেন শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী রোড, মন্দিরের নাম ব্রজধাম—শ্রীশ্রীমায়ের ও অন্যান্য আশ্রমিকাদের বাসস্থান (আশ্রম) এর প্রতিটি বিভাগের আলাদা নামকরণ করেছেন মা। (১) সুভবন—শ্রীশ্রীমায়ের কক্ষ (২) সুকুটীর—মাতৃজননী দিদিমার কক্ষ (৩) মাতৃধাম—শ্রীশ্রীমা যেখানে সন্তানদের নিয়ে দোতালাতে বসেন ও নানারকম আলোচনার মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে থাকেন (৪) মিতালি—যে কক্ষে একে অন্যের সাথে

জড়িয়ে বাস করেন আশ্রমিকারা। (৫) শ্যামলী—সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দোতালায় যে বারান্দাটি, সেখানে দাঁড়ালেই সবুজের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায় (৬) সোনালী—মাতৃকক্ষের সামনের বারান্দাটি—ভোরের সোনালী রোদ এসে ঢেউ খেলে যায় (৭) কচ্‌কচি্‌—ভাঁড়ার-ঘর—যেখানে আশ্রমের প্রসাদ-ব্যবস্থার জন্যে সব সময় ব্যস্ততা থাকে (৮) ভোগমন্দির—ভোগ রাঁধবার জায়গা (৯) ব্রজধামের পেছনে বেল ও অশ্বত্থ গাছের ছায়ার নাম মাতৃচ্ছায়া।

আশ্রমিকাদের কথা না বল্‌লে আশ্রমের অঙ্গই বাদ পড়ে যাবে। প্রতিটি আশ্রমিকা যেন আনন্দের নির্ঝরিণী। সত্যি, এত সুন্দর পরিবেশ যে অবাক বিস্ময়ে মনে হয় আত্মায় আত্মায় পরম যোগাযোগ—প্রাণের নিবিড়ে সহজ সংযোগ। কত আপন এরা—মনে হয় যুগযুগান্তের পরিচিত—সবাই যেন মুখের হাসিটি নিয়ে আপন-করা ভাবে বিভোর। 'মা-মণি' যে এদের প্রাণকেন্দ্র আর ওরা সবাই মা-মণির অচ্ছেদ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আনন্দের উৎস—মা জননী, আর এরা যে সবাই আনন্দের উৎস-ধারা!

অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম সন্ত-আশ্রমে বেনারসধামে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

আবার সেই পুণ্যতিথি—জন্মোৎসব তিথি—এসেছে অর্ধশত বৎসর পার করে এই ধরণীর পরে। তাই, জগৎগুরু, জগন্মাতা শ্রীশ্রীশোভামায়ের এই আবির্ভাব-উৎসব। ১৫ দিনব্যাপী উৎসব চলবে, মায়ের ছেলেমেয়েদের সাধ। মা কি সন্তানদের বাসনা অপূর্ণ রাখতে পারেন? একটুকু সাধ ও যাতে অপূর্ণ না থাকে তার জন্যে শ্রীশ্রীমা দশভুজা হয়ে চতুর্দ্দিকে সন্তানদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে—দিচ্ছেন পরিকল্পনা, দিচ্ছেন ভুল-ত্রুটি শুধ্‌রে, সর্বোপরি দিচ্ছেন তাঁর প্রিয় সাহচর্য্য। মাঝে মাঝে যেন কত অসহায় এইভাবে বল্‌ছেন—"আমি কি জানি, তোম্‌রা যা ভাল বোঝ তাই কর।" মায়ের এই রূপটি বড়ই মধুময়—ছোট্ট শিশুর মতন কতই যেন অসহায় ভাব! আবার মায়ের মন গভীর উদ্বেগে উৎকণ্ঠিত—এতদিনব্যাপী

উৎসব—তাঁর সন্তানেরা অসুস্থ হয়ে পড়বে নাতো? মাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব ভাস্বর শাশ্বত মূর্ত্তি!

সন্তানদের মনে কিন্তু একটুকুও দ্বিধা নেই—"মা তো রয়েছেন আমাদের সাথে—আর ভয় কি?" "জয় মা" বলে—মায়ের পায়ে প্রণতি জানিয়ে কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

(খ)

এলো ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১লা ফাল্গুন—শ্রীশ্রীমায়ের অধিবাস-উৎসব-সন্ধ্যা—

অপরাহ্ণে সদ্যঃস্নাতা মাতা রক্তিমপাড়ের গরদের শাড়ী পরে এসে বসলেন মাতৃধামে নিজের আসনে। সেই আসনটি পরিবেষ্টিত করে চিত্রিত হয়েছে সুকারুকার্য্যযুক্ত আল্পনা। সন্তানেরা মায়ের চারিপাশ ঘিরে বসে—সবাই প্রণতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছেন—অন্তরের শ্রদ্ধার সঙ্গে।

নানা ভাষার ও নানা দেশীয় লোক সমবেত হয়েছেন শ্রীশ্রী১০৮ শোভামাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও শুভকামনা জানাবার জন্যে।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখে স্বচ্ছ জ্যোতির আলো—মুখমণ্ডল অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত রঙে রঞ্জিত—তারি মাঝে শিশু-সুলভ মধুর হাসির ছোঁওয়া লেগে রয়েছে। শ্রীশ্রীমা যেন বল্‌ছেন—"ওরে আমি এসেছিরে এসেছি তোদের মাঝে। তোদের সাথেই আমি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি—তোদেরই যে একান্ত আপনজন আমি।"

মাগো! অভিভূত হয়ে তোমার উজ্জ্বল মাতৃমূর্ত্তি দর্শন কোরলাম—অন্তঃস্থল থেকে অস্ফুটস্বরে মা মা ধ্বনি উঠতে লাগলো। মাগো তুমি অযাচিত করুণা-কৃপা বর্ষণ করছো সন্তানদের তরে।

শ্রীশ্রীমায়ের অধিবাস-প্রস্তুতি শেষ। মায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা-উপহার দ্রব্যসম্ভার উৎসর্গ করে দেবার জন্যে ব্রজধামে শ্রীশ্রীঠাকুরজী ও ৺দাদা-গুরুজী মহারাজদের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী ও রাধারাণী সেজেছেন রাজবেশে—সেজেছেন সব দেবদেবীগণ—মায়ের আগমনীর আনন্দে সবাই আত্মহারা! উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছেন মায়ের আগমনীর পথ চেয়ে—তাঁদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হাসিতে পরিপূর্ণ। আমাদের পরম আদরের 'মা-মণি' অতি লঘু পদসঞ্চারে ৺ঠাকুরজীর সামনে স্থাপিত নিজ আসনে এসে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা-আরতি ও বন্দনা-গীতি সুরু হোল।

আত্মস্থ ও ধ্যানস্থ মূর্ত্তিতে মা দাঁড়িয়ে—মনে হচ্ছিল তিনি অন্তরে অন্তরে মিশে গিয়েছেন—পরম গুরুর সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে। মায়ের শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে ছিল আসনের উপরে।

শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সাথে মায়ের বরণ ও অভিষেক হোল। সর্ব্বশেষে মা নিজেকে আহুতি দিলেন সর্ব্ব দেবদেবী ও গুরু মহারাজজীদের চরণে, প্রণামের মাধ্যমে—নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে। তখন মনে হচ্ছিল সেখানে যত গুরুশক্তি ও দেবদেবী আছেন—আশিস্‌ধারায় তাঁদের মানসীকন্যাকে অভিষেক করলেন। বহুক্ষণ ঐ অবস্থায় থেকে মা উঠে পূজ্যপাদ সব আচার্য্যদেব ও গুরুমহারাজজীদের জয়ধ্বনি দিলেন।

মায়ের আগমনীর আনন্দে ব্রজধামে আগমনী সুর বেজে উঠলো—"জয় মাতাজী কী জয়", "জয় শ্রীশ্রী১০৮ শোভামাতাজী কী জয়", "জয় মাতাজী কী জয়"। আনন্দে সন্তানেরা মায়ের জয়ধ্বনি দিলেন। ভজন ও মৌন প্রার্থনা দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-অধিবাসের দিনটি সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হোল।

এখানে বলে রাখি, আমি আশ্রম থেকে দূরে ছিলাম বলে—প্রতিদিনই কিছু কিছু অনুষ্ঠান থেকে বাদ পড়ে গিয়েছি। যে বিশেষ কয়েকটি দিন আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে রয়েছে ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা-আশিসে অপরূপ ছন্দে ছন্দিত হয়েছে আমার তৃষিত জীবনের মাঝে—যে অসীম আনন্দ আমি পেয়েছি—তা আমি হৃদয় উজাড় করে বিলিয়ে দিতে চাই সবার মধ্যে—মায়ের আদেশে ও আশীর্ব্বাদে।

শ্রীশ্রীমা আমায় জানিয়েছিলেন—"তোমার প্রচেষ্টার পেছনে থাকবে আমার আশীর্ব্বাদ।"

মায়ের আশীর্ব্বাদই আমার জীবন-পথের একমাত্র পাথেয়। "জয় গুরু—জয় মা"!

(গ)

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২রা ফাল্গুন—

শুভক্ষণ সমাগত—প্রত্যুষে ৪-২০ মিনিটে, শ্রীশ্রীশোভামায়ের শুভ জন্মলগ্নে পঞ্চাশবার শঙ্খ ধ্বনিত হোল ব্রজধাম নাটমন্দিরে, শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-উৎসব-পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে। তারই সাথে পঞ্চাশবার মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি-দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হোল। শঙ্খ ও হুলুধ্বনির তরঙ্গে আকাশে, বাতাসে মায়ের আগমনী বাণী ঘোষিত হোল—"মা এসেছেন এই ধরণীর ধূলিতে, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের শোভার আধার শোভাময়ী মা এসেছেন মোদের মাঝে"!

ধ্যান-স্তিমিত আলোতে—উষার আলোর রঙে রঙা—স্নিগ্ধ শান্তরূপে, আস্তে আস্তে, প্রভাত আলোর ছোঁওয়া লেগে, অপরূপ হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—প্রকৃতি-প্রান্তর—মা জননী এলেন!

বিশেষ ভঙ্গিমায়, শ্রদ্ধার সাথে সাথে, বরণ করা হলো পঞ্চাশটি ঘৃতপ্রদীপ দিয়ে—মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সব সন্তানগণ ভক্তি বিনম্রচিত্তে মায়ের চরণে অঞ্জলি প্রদান করলেন—মাতৃপদযুগল স্পর্শ করে মাতৃকরুণা লাভ করলেন।

অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি-দর্শনে জীবন আমার পূর্ণ হয়ে অশেষ কৃপাতে ধন্য হোল।

শ্রীশ্রীমা মহাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে সমাধিস্থা হলেন—আস্তে আস্তে বংশীধারীরূপ ধারণ করে জানিয়ে দিলেন—তিনি শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর পূর্ণ অংশ, মহাভাবে রাধা—যুগলরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিতা!

ভাবের মাঝেই আবার শ্রীশ্রীমায়ের হাত দু'টি বরাভয়-আশীষদায়িনীরূপে প্রকাশিত হোল, অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহে মণ্ডিত হয়ে।

সকাল ৬-৩০ মিনিটে আরম্ভ হোল—প্রভাতী আরতি ও স্তোত্রপাঠ। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী, রাধারাণীজী, কিষণলাল সেজেছেন অতি অপূর্ব্ব মনোহর বেশে। জাগ্রতরূপে, আনন্দে উজ্জ্বল বিগ্রহ-মূর্ত্তি—সচলরূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন—শ্রীশ্রীমাকে আজ তাঁদের অন্তরের আশীর্ব্বাদ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে, মায়ের আবির্ভাব-উৎসবে যোগ দিতে !

এই উৎসবের প্রতিটি দিনে, শ্রীশ্রীঠাকুরজী, রাধারাণী, কিষণলাল ও অন্যান্য বিগ্রহজীদের বেশ-পরিবর্ত্তন সত্যিই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কোরবার বিষয়। পরম নিষ্ঠায়—অন্তরের ভক্তি-সুধার দরদে, প্রতিটি বেশবাসে, প্রতিটি বিগ্রহমূর্ত্তি সচলরূপ ধারণ করতেন। বিভিন্ন রঙে, নূতন পরিচ্ছদে, রোজ বেশ পরিবর্ত্তিত হোত—গভীর অনুরাগের সাথে। ধন্য তিনি, যিনি এই বেশ পরিবর্ত্তন করাতেন—প্রাণের আরাধনায়, অন্তরে ঠাকুরের রূপটি নিয়ে! প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতেন—দেবদেবীগণ !

প্রণাম জানাই সেই প্রাণময়ী মাকে—যাঁর মাঝে লুকিয়ে আছে অনন্তময়ের অনন্তলীলা—যাঁর প্রতিটি অঙ্গে রয়েছে পরম গুরুর প্রসাদ !

সকাল ৭-৩০ মিনিটে আরম্ভ হোল বিশেষ মাঙ্গলিক হোম আর তারই সাথে চলতে থাকলো অখণ্ড গীতা, সমগ্র চণ্ডী, ভাগবত, সামবেদ ইত্যাদি পাঠ।

বেলা ১০টাতে রাজভোগ ও বিশেষ আরতির পর বেলা ১১টাতে বৈষ্ণব ও সাধু-সেবা। তাঁরা সবাই সমবেত হয়েছেন ব্রজধামে—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনের উৎসব-আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্থললিত স্বরে ভক্তিমূলক ভজন ও গান কোরেছিলেন।

বৈষ্ণব ও সাধুসেবার আগে শ্রীশ্রীমায়ের ভাব অপরূপ—প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছিল। সদাহাস্যচঞ্চলতাময়ী মা প্রাণের আবেগে, বিদ্যুৎগতিতে ঘোরাফেরা করছেন। মাকে দেখা যাচ্ছে রান্নার জায়গায়, মাকে দেখা যাচ্ছে খাবার জায়গায়—ভাঁড়ার ঘরে—পরিবেশনের মাঝে—যে দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখতে পাচ্ছি—মা আর মা—সারা আশ্রমটি মা-ময় !

সব কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে মা নিজেকে নিয়োজিত করেছেন সন্তানদের সঙ্গে—প্রতিটি কাজে উৎসাহ উপদেশ দিচ্ছেন—যেন সন্তানদের কোন কাজে কেউ ত্রুটি ধরতে না পারে।

সন্তানদের জন্যে অসীম স্নেহে মায়ের হৃদয় উদ্বেলিত, বিচলিত। দশ-প্রহরণধারিণী দশভুজা-মূর্ত্তিতে—মা জগৎজননীরূপে বিরাজমান!

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে সন্তানগণ 'জয়' দিয়ে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করছেন। শত শত কাজের মাঝে মা আমাদের শত শত লোকের সহস্র রকম আব্দার মেনে নিচ্ছেন ও দর্শন দিচ্ছেন—দিচ্ছেন নানা প্রশ্নের উত্তর—সমাধান করে দিচ্ছেন নানা সমস্যার।

শ্রীহস্তে অন্নপূর্ণা মা আমার সাধু-বৈষ্ণবদের পরিবেশন করলেন—মিষ্টি ও খাদ্যদ্রব্য। পরিতৃপ্তি সহকারে সাধুগণ প্রসাদ নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে দক্ষিণা গ্রহণ করলেন—শ্রীশ্রীমায়ের জয়ধ্বনিতে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠলো।

শুনেছি এই সাধু-সন্তদের মাঝে দূর পর্ব্বত থেকে আসেন উচ্চধরণের মহাপুরুষ—অতি সাধারণভাবে—অন্তরে অন্তরে শ্রীশ্রীশোভামায়ের আছে নিবিড় যোগাযোগ।

সারাদিন অভুক্ত থেকে, মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মুখে ছিল না কোন ক্লান্তির ছায়া—আনন্দে উজ্জ্বল সে মুখ, মাতৃস্নেহের আলোতে উদ্ভাসিত!

কিন্তু, মন্দিরে ঢুকে প্রত্যক্ষদর্শন করেছি—শ্রীশ্রীমায়ের সব ক্লান্তি শ্রীশ্রীরাধা-বিহারীজী গ্রহণ করেছেন। তাঁর মুখে ক্লান্তির ছায়া।

জয় শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর জয়—শ্বেত প্রস্তরে তোমার গঠিত বিগ্রহ-মূর্ত্তির প্রাণময় কোষে কোষে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে, মাতৃমূর্ত্তির মহাভাবে পূর্ণ হয়েছে। ধন্য আমরা! মায়ের স্নেহ-কৃপায় পেলাম তোমার দরশন!

(ঘ)

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ৩রা ফাল্গুন—প্রভাতে আরতি ও স্তোত্র-পাঠান্তে বেলা ৯টার সময় পণ্ডিত-সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীশ্রীমা আন্তরিক নিষ্ঠায় সবাইকে বরণ করে, শ্রীহস্তে সবাইকে অর্ঘ্যদান করে, উপযুক্ত মর্য্যাদা দিলেন—তৃপ্তি সহকারে সবাই প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

রোজ শত শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করতেন! শ্রীশ্রীমায়ের দ্বার থেকে কেউ অভুক্ত ফিরে যান নি।

প্রতিদিন মা জননী নিজের হাতে সন্তানদের পরিবেশন করতেন প্রসাদ-সম্ভার—অকৃপণ হস্তে। মায়ের দেওয়া প্রসাদে সকলেই পরম তৃপ্ত। মাতৃস্নেহের মধুর নির্য্যাসে সকলেরই মন সিক্ত। অন্নপূর্ণা মাতৃমূর্ত্তি-দর্শনে জীবন ধন্য!

পরের দিকে এমন হয়ে গিয়েছিল—শ্রীশ্রীমায়ের নিজের হাতে দেওয়া প্রসাদ না পেলে, পরিপূর্ণ প্রসাদ নিয়েও মনে হোত, কি যেন বাকী রয়ে গেছে! 'মা-মণি" কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে মনের সে অভাবটুকু পূর্ণ করে দিতেন। সন্তান যে মাতৃহৃদয় থেকে অভিন্ন তা তিনি সর্ব্বতোভাবে বুঝতে দিতেন।

বিকাল ৪টার সময় মায়ের সন্তানগণ শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী, পরম দাদাগুরুজী, শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী ও শ্রীশ্রীমায়ের আলেখ্য-চিত্র নিয়ে শোভা যাত্রা করে বের হলেন নগর পরিক্রমায়। মায়ের জয়-ধ্বনি গগনে ছড়িয়ে যেতে লাগলো। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং শোভাযাত্রা পরিচালনা করে দিলেন আশ্রম-প্রাঙ্গণ থেকে।

পরিক্রমা শেষ করে আশ্রমে সবাই ফিরে এলে, শ্রীমা নিজের হাতে বাদাম-বাতাসা লুট দিলেন! উৎসাহে, আনন্দে সবাই ছেলেমানুষ হয়ে গেছে—লুটের বাদাম, বাতাসা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। শোভাযাত্রা ও লুটের পর্ব্ব শেষ হয়ে সন্ধ্যা-আরতি আরম্ভ হোল মন্দিরে।

সন্ধ্যা-আরতির শেষে আরম্ভ হোল নৃত্য-নাটিকা—'হোলি।' আশ্রম-

বাসিনীদের দ্বারাই নৃত্য-নাটিকা অভিনীত হয়েছিল। যতক্ষণ অভিনয় চলছিলো মনে হচ্ছিল—সেই বৃন্দাবনে হোলির উৎসবে মেতে রয়েছি আমরা—নৃত্য ও রচনার ভঙ্গীটি বড় সুন্দর।

প্রতিদিন নানাবিধ আধ্যাত্মিক আলোচনার সাথে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজনে উৎসবের দিনগুলি অন্তরের নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালিত হচ্ছে। এই উৎসবের প্রাণ-কেন্দ্র "শ্রীশ্রীমা"—উৎসব-আনন্দে সন্তানদের নিয়ে মেতে রয়েছেন।

শিশুদের প্রতিযোগিতামূলক খেলা-ধূলা, কিশোর-কিশোরীদের—এমন কি, ৪০ বছরের উর্দ্ধে ও যারা রয়েছেন—প্রতিযোগিতায় তারাও স্থান পেয়েছিলেন। ছোট-বড়দের কবিতা-আবৃত্তির ও গীতার একটি অধ্যায় পাঠের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার-বিতরণ উৎসব-অনুষ্ঠান-সূচীর আর একটি অঙ্গ। তারপর ছিল সান্ত্বনামূলক প্রাইজ—লুটের সাথে মিষ্টি লজেন্স। ওটাতেই আমি সবচেয়ে বেশী উৎসাহী। প্রতিটি অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা সমভাবে ও সমান উৎসাহে যোগদান করেছিলেন। মায়ের এই অফুরন্ত উৎসাহের ভাণ্ডার নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন—যার জোয়ার এসে লেগেছিলো সন্তানদের মধ্যে। ছোট, বড়, বৃদ্ধ—সবাই এসে যোগ দিচ্ছিলেন প্রতিযোগিতায়।

ধন্য মা তুমি! আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই তোমার স্নেহের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে, তোমারি আনন্দ-পরিবেশনে, ছোট্ট শিশু হয়ে, আনন্দময় জগতে বাস করছে। স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী মায়ের স্পর্শে সবাই আনন্দে আত্মহারা। জয় আনন্দরূপিণী শ্রীশ্রীশোভা মা কী জয়!

(৬)

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ৪ঠা ফাল্গুন, দুপুর ১২টা থেকে অতি সুষ্ঠুভাবে দরিদ্র-নারায়ণসেবা ও অর্থদান সম্পন্ন হয়। দলে দলে এসে মায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রসাদ নিলেন দরিদ্রনারায়ণেরা।

এখানেও শ্রীশ্রীমায়ের সমান তৎপরতা—কেউ যেন অভুক্ত অবস্থায় প্রসাদ না নিয়ে ফিরে না যান—মায়ের কর্ম্মী সন্তানেরাও সতর্ক ও সজাগ।

প্রতিদিন আমার মাকে দেখেছি—উৎসবময়ীরূপে—উৎসাহে ভরপুর! প্রতিদিন আমার মাকে দেখেছি—প্রসাদ পাবার সময়—মা সবাইকে নিজে ডেকে খুঁজে আনতেন—পাছে কেউ বাদ পড়ে যায়! দেখেছি—আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীদের জন্যে উদ্বেগ ও চিন্তা। শুধু কি আশ্রমবাসিনী? উৎসবে আগত সন্তানেরা কোথায় কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার সেবা-পথ্যের ব্যবস্থা করা, কে কখন যাবে তার ব্যবস্থা করা—কার কি অসুবিধা হচ্ছে—তার সুবিধা করে দেওয়া—চারিদিকে এত কাজ ও সমারোহের মধ্যে মায়ের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি পরিপূর্ণ সজাগ!

সেদিন সন্ধ্যায় ছিলো মাইকড্রামা—শ্রীশ্রীমায়ের রচিত "প্রেমের ঠাকুর" নাটকটির রূপদান করলেন মায়ের গুণী সন্তানেরা প্রাণের দরদে। মাইকড্রামা যে এত সুন্দর ও প্রাণময় হতে পারে—নিজে না শুনলে ধারণা করা যাবে না।

নাটকটি ছোট, কিন্তু, ভক্তিরসের ধারায় স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল—সকলেরই শিক্ষাপ্রদ।

'নাটকটির' মূলকথা—ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে সন্তানরূপে আসেন তাদের সংসারে; কিন্তু, তখন যদি ভগবানকে ভুলে সন্তানের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে থাকেন—তখন মায়াও ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়—সন্তানকে হারাতে হয়। তাই, ভগবানের সেবাব্রত ভুলে গেলে চলবে না—সব কাজেই তাঁর উপরেই বড় নির্ভর করে চলতে হবে।

মায়ের নাটকের বিশেষ রূপটি যদি আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ করতে পারি তবেই মায়ের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

(চ)

শ্রীশ্রীমায়ের লীলামাধুরী

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ৫ই ফাল্গুন—

প্রভাতের ভোগ, আরতি শেষ হবার পরই সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো—মায়ের সাথে শোভাযাত্রা করে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ-দর্শনে যাওয়া হবে। শ্রীশ্রীমা যে মোটর গাড়ীতে যাবেন সেটিকে মায়ের যোগ্য সন্তানেরা সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছেন। কি আনন্দ, কি আনন্দ! তার আগের দিন রাত থেকেই মনে একটা অসীম আনন্দ অনুভব কোরছিলাম! বেনারসে গঙ্গাজীতে কোন দিনই অবগাহন স্নান করিনি। শুনেছি, সর্ব্বপাপ ও তাপ নাশিনী গঙ্গার স্নিগ্ধ পরশে মন সজীব ও শান্ত হয়। তারপর আমরা যাচ্ছি শ্রীশ্রীঅমৃত-সুধা-সলিল-স্বরূপিণী মায়ের সাথে!

কিছুদিন আগে এ সম্বন্ধে আমি একটা খুব সুন্দর বাস্তব স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখছি—শ্রীশ্রীমা এসেছেন আমাদের বাড়ীতে; আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মাকে বলছি—মাগো! ম্লেচ্ছ মেয়ের বাড়ী এসেছ, কোথায় তোমায় বসাবো? তুমি একটু অপেক্ষা করো—আমি গঙ্গাজলে সব মুছে দিই। শ্রীশ্রীমা আমার কথা শুনে হেসে কইলেন—কেন রে, আমি নিজেই তো গঙ্গা! আমিই এসেছি—গঙ্গাজলের দরকার কি? বলে, সব ঘরে ঘরে ঢুকলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। এ স্বপ্নের তাৎপর্য্য সহজ ও সরল—শ্রীশ্রীমা যে একাধারে সব হয়ে রয়েছেন—বৃথা আমরা দৌড়াদৌড়ি করে সময় নষ্ট করি!

খুব ভোরে যেয়ে আশ্রমে উপস্থিত হোলাম—দেরী আর সইছিলো না। কিন্তু, আমি কি জানতাম কৃপাময়ী মায়ের লীলার স্বরূপ? স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি—মায়ের অসীম করুণায় ধ্বনিত হোল ব্রজধামে অপূর্ব্ব লীলাময় ছন্দের ছন্দোবন্দনা!

শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথজী দর্শন করবো, মায়ের সাথে গঙ্গায় স্নান করবো—তাই,

মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম তার আগে পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকবো। সকালবেলা ভোগ-আরতির পর সবাই শ্রীশ্রীমায়ের হাতের প্রভাতী প্রসাদ নিতে ব্যস্ত। ব্রজধামে একলা বসে আছি—নিজের মধ্যে মায়ের আশীর্ব্বাদে কখন নিবিষ্ট হয়ে গেছি জানিনা। ঐ অবস্থায় শুনতে পেলাম—লঘুপায়ে অপূর্ব্ব নৃত্যের ছন্দে কে যেন নূপুর পায়ে চলা-ফেরা করছেন—রুনুঝুনু মিঠে আওয়াজ অন্তরে এসে শিহরণ জাগিয়ে তুলছে—চোখবুঁজে সেই সুরের ছন্দ অনুভব করতে লাগলাম ভারী মিঠে আওয়াজ। কিছুক্ষণ পরে যখন নিজের মধ্যে ফিরে এলাম—তখন মনে হোল, উৎসব উপলক্ষ্যে অনেকেই এসেছেন—কোন মহিলা বোধহয় মল বা তোড়া পরে ব্রজধামে এসেছিলেন—তার থেকেই আওয়াজ পেয়েছি। তাকিয়ে দেখলাম—কোথাও কেউ নেই।

মন পুরোপুরি সজাগ হয়নি—আবিষ্টভাব তখনও রয়েছে। আবার যখন নিজের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে গেলাম—আবারও শুনতে পেলাম, সেই সুরের ছন্দ—কেউ লঘু ছন্দে নূপুর পায়ে রিনিঝিনি আওয়াজ তুলে নেচে চলেছেন।

অনভিজ্ঞ, অবিশ্বাসী মন বারবারই ভাবছে—মন্দিরের বাইরে থেকেই হয়তো এই আওয়াজ আসছে।

বাইরে এসে তাকিয়ে দেখলাম—তোড়া কিম্বা মল পরে তো কেউ হাটছেন না। আমি একটু এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলাম। সামনে ব্রহ্মচারিণী সুধা দেবী ছিলেন—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাইছি। জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাঁকে খুলে বোললাম; তিনি বললেন—শ্রীশ্রীমাকে জানাতে। শ্রীশ্রীমা তখন উপরে তাঁর শয়ন-কক্ষে ছিলেন। আমি গিয়ে সঙ্কুচিত চিত্তে, মনে দ্বিধা নিয়ে—আমার বক্তব্য নিবেদন কোরলাম। মায়ের মুখখানি আলোর শ্রীতে ভরে গেলো।

মা-মণি মধুর হেসে বললেন—

"ব্রজধামে এরকম শুনে থাকে—আমার ঠাকুরজী বড় তুষ্ট।"

যখন আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম—"মাগো, বল তবে আমি কি শুনেছি? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

শ্রীমা অত্যন্ত সান্ত্বনার স্বরে বললেন—"তুমি তাঁরি চরণের নূপুর-ধ্বনি শুনেছ।"

আমি এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ—কোন রকম জ্ঞানই ছিল না আমার——সজ্ঞানে এও কি সম্ভব?

স্নেহময়ী মাকে প্রণাম করে তাঁর উদার হৃদয়ের অসীম কৃপার কথা ভেবে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

কি মূর্খ আমি—মায়ের আশিসে যা পেলাম—তাও অবিশ্বাসের ছোঁওয়ায় পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারলাম না। স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম না—বাইরে তাঁকে বৃথাই খুঁজে হারিয়ে ফেললাম। মাগো! তোমার জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, মেয়েটিকে ক্ষমা ক'রো তুমি।

শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীশ্রীমায়ের সাথে গঙ্গাস্নানে গেলাম—আনন্দে মায়ের জয়ধ্বনি দিতে দিতে।

মায়ের কৃপায় অতি সহজেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-দর্শন ও স্পর্শন হোল—স্বয়ং বিশ্বের নাথ যে আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন—সেখানে আর মুস্কিলটা কোথায়?

মায়ের আশীষে তখনও সকল শব্দ ছাপিয়ে নূপুরের মধুর গুঞ্জন-ধ্বনি আমার কানে ও মনে লেগে ছিল। মাগো! তোমার লীলা তুমিই জানো—অনন্ত-লীলারূপিণীর অনন্ত খেলা বুঝবার আমাদের সাধ্য কই—তিনি কৃপা করে বুঝিয়ে না দিলে!

মাগো! তোমার লীলার খেলায় ভুলিয়ে রেখো না—তোমার আশীর্ব্বাদে আসে যেন পূর্ণ উপলব্ধির অনুভূতি!

গঙ্গা-স্নানে প্রাণ-মন জুড়িয়ে গেলো। গঙ্গার পবিত্র জল শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্রতর চরণস্পর্শে আনন্দে উছল হয়ে কুলুকুলু ধ্বনি করে উঠলো। গঙ্গাস্নানে যে এত আনন্দ পাওয়া যায় এই প্রথম মায়ের স্নেহে তা অনুভব কোরলাম।

সবই কোরছি, সবই বলছি—কিন্তু অন্তরে বেজে উঠছে একটি মধুর সুর—আর আমার মায়ের মুখপানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি—সদ্যঃস্নাতা মায়ের মুখে স্বরগের সুষমা ঘিরে রয়েছে; আনন্দময়ী মা আমার আনন্দে উদ্বেল—উৎসাহের আর পরিসীমা নেই!

হঠাৎ দেখি, বড় বড় কয়েকটা নৌকা এসে ঘাটে ভিড়লো। শুনলাম নৌকা করে গঙ্গাবিহারে যাওয়া হবে। দেখি, মা-মণি একটা নৌকাতে উঠে সবাইকে বলছেন—নৌকাতে উঠবার জন্যে। শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি পেয়ে, আমরা ভাই-বোনেরা—সবাই মিলে নৌকাগুলিতে উঠলাম। মায়ের নৌকা আগেই ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল। সবাইকে নিয়ে নৌকা মাঝগঙ্গা দিয়ে চলতে লাগলো।

'মা-মণির' নির্দ্দেশে সব নৌকাতে নাম-কীর্ত্তন সুরু হোল। গঙ্গাস্নানে পবিত্র দেহ-মন—নাম-কীর্ত্তনের মিষ্টি সুর বড়ই মধুর প্রভাব বিস্তার কোরছিলো। আমার গলায় সুর নেই। আমি ও যেন অন্তরের প্রেরণায় নাম-গান করতে লাগলাম।

সেদিন বেশ ঠাণ্ডা ছিলো। মিঠে রোদে উজ্জ্বল হয়ে গঙ্গাজী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছিলেন। মায়ের উপস্থিতিতে সে শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হয়েছিল। স্বল্প দূর থেকে শ্রীমাকে দর্শন কোরছিলাম—সূক্ষ্ম অপার্থিব উজ্জ্বল জ্যোতির আবরণে মায়ের মুখ আচ্ছাদিত—অতি অপূর্ব্ব দেখাচ্ছিলো তাঁকে—মনে হচ্ছিল, শত শত প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধ-জ্যোতি মায়ের মুখমণ্ডল ঘিরে রয়েছে—তাঁর অন্তরের গভীর আনন্দের স্পর্শে আমরাও ডুবে যাচ্ছিলাম!

মাগো মা! তুমি দেবী কি মানবী—তা আমি জানিনা—শুধু জানি, তুমি আমাদের স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, স্নেহ-বৎসলা, আদরিণী, জননী—বিশ্বজননী—সর্ব্ব শোভার আধার তুমি! শ্রীশ্রীশোভাময়ী!

মাগো! গঙ্গাস্নানে কি পুণ্য জানিনা—কিন্তু, তোমার সাথে গঙ্গাস্নানের অপার্থিব আনন্দে মন ও হৃদয় পরিপূর্ণ!

(ছ)

মায়ের লীলা-মাধুরী

২০শে ফেব্রুয়ারী, ৭ই ফাল্গুন—

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ৬ই ফাল্গুন বিকালে ছোটবড়দের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা ছিল। সন্ধ্যায় বন্দনা-গান ও বাণী-জীবনী-লীলার পাঠের মাধ্যমে পরম দাদাগুরুজী শ্রীশ্রী১০৮ রামদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজের স্মৃতিপূজা সুসম্পন্ন হোল।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ৭ই ফাল্গুন বিকালে অনুষ্ঠিত হোল—বড় ভাই-বোনদের স্পোর্টস—বয়সের সীমা ১৫ থেকে ৬০ বছর পর্য্যন্ত। সে কি উৎসাহ—মায়ের কাছে সবাই শিশু!

বিকালে দাদাগুরুজী শ্রীশ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হোল। বিশেষ সুধী ও সজ্জন ব্যক্তিরা, যাঁরা তাঁদের সাহচর্য্য ও কৃপা লাভ করেছেন—তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বোলছিলেন। শুধু, একটি কথা তন্ত্রীতে ঘা দিচ্ছিল যে অতি অভাজন মানবও কি ভাবে মহাপুরুষদের কৃপা পেয়ে থাকেন—সেটার বিচার-বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি না—আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সন্ধ্যাবেলা ব্রজধামে আরতি ও স্তোত্র-পাঠ আরম্ভ হোল। রোজই পূজারিণী আশ্রমিকা আরতির মধুর ছন্দে নিজেকে নিবেদন করতেন—সেই মহান্ দেবতার শ্রীচরণে—মাতৃচরণে!

শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর দিকে তাকিয়ে একমনে বসে আছি—মুগ্ধ দৃষ্টিতে। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো শ্রীশ্রীঠাকুরজীর শ্বেতমর্ম্মর-বিগ্রহের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। বড় সুন্দর, জীবন্ত, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর এই বিগ্রহমূর্ত্তি—অপলক নয়নে চেয়ে থাকলে যে কত বিশেষ ভঙ্গিমাই চোখে পড়ে! কখনও মনে হয় চোখ দুটি মিটি মিটি করছে দুষ্টু হাসিতে, অধর স্ফুরিত হচ্ছে শ্রীমায়ের কাছে

আব্দারে, অভিমানে ; আবার বংশীধারী হাত দুটি ছাড়াও দেখা যাচ্ছে বরাভয় দুটি হস্ত—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে। একাগ্র মনে তাকিয়ে থাকলে শ্রীশ্রীমায়ের জাগ্রত রাধাবিহারীজীর বিশেষরূপগুলি অনুভূত হয় !

মঙ্গল ঘণ্টার তালে তালে প্রদীপের আলোতে ঠাকুরজীদের বরণ চল্ছে—তার মাঝে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর ভ্রূযুগলের মাঝখানে জ্বলজ্বল করে নীল আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখ্লাম। আমি তখন ঠাকুরজীর দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে বসে আছি আর ভাবছি ঠাকুরজীর ত্রিনেত্র হিসাবে ওখানে একটা বড় হীরকখণ্ড খচিত আছে। আমি তো বিশেষ কিছু জানি না, নূতন এসেছি : আজ হয়তো প্রদীপের আলো বিশেষ ভাবে পড়াতে হীরক-খণ্ডের নীল আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ নয়নে ঠাকুরজীর দিকে চেয়েই আছি—এ দিকে শ্রীশ্রীমায়ের সুললিত কণ্ঠে "ভব সাগর তারণ' গানটি ধ্বনিত হোল।

আরতি ও স্তোত্রপাঠ সমাপনান্তে—শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব্ব, অনবদ্য কণ্ঠ টেপ-রেকর্ডে ভেসে উঠলো—দরদী ভাষায় তাঁর রচিত "স্মৃতি"—মহান্ গুরুদেব শ্রীশ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের উদ্দেশ্যে। 'স্মৃতির' প্রতিটি ছত্রে ছড়িয়ে আছে গুরুগত-প্রাণা মায়ের পরমশ্রদ্ধায় ও বিহ্বল ভাষায় শ্রীমায়ের দুর্লভ গুরুদর্শন ও গুরুলাভের অমর স্মৃতিকথা—শ্রীগুরুকে স্থূলতঃ হারাবার বেদনা-বোধ—একাগ্র আকুলতায় স্থূলতঃ হারিয়েও আবার ফিরে পাওয়া—যে পাওয়া চিরন্তন ও শাশ্বত—যে পাবার লয় নেই, ক্ষয় নেই, বিচ্ছেদ নেই—আনন্দে আনন্দময় ! শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-পাঠ সবার মনে এনে দিল গভীর আলোড়ন—গুরুভক্তির পরমনিষ্ঠায় অন্তর হোল শুদ্ধ—প্রাণ হোল নিমগ্ন !

(জ)

২১শে ফেব্রুয়ারী, ৮ই ফাল্গুন—সকাল ৯টায় মাতৃপ্রণাম। পাঁচটি গঙ্গাজলের পাত্র থেকে কিছুটা করে গঙ্গাজল একসাথে মিশিয়ে—একটি পাত্রে রেখে—

সেই জলের সাথে কাঁচা হলুদ বেঁটে মিশিয়ে দিয়ে—নব শ্যামল দূর্ব্বাদল মিলিয়ে দেওয়া হোল শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে।

পীতবসন গঙ্গাজলের সাথে নবদূর্ব্বাদলের শ্যামল-শ্যামরূপ—নবরূপে সজ্জিত হয়ে—উন্মুখ হয়ে উঠলো মায়ের চরণে উৎসর্গীকৃত হ'তে! শ্রীশ্রীমাকে বরণ করে, সেই পবিত্র গঙ্গাজল তিনবার করে মায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করে, হুলুধ্বনি করলেন ও মায়ের পায়ে প্রণত হয়ে তাঁর দুর্লভ পদরজঃ মাথায় তুলে নিলেন।

মায়ের সেই সময়কার ভাব, অবস্থা বর্ণনা করা আমার এ লেখনীর সাধ্য নয় —অনন্তরূপের সাথে মায়ের রূপ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল—মায়ের স্নেহের স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে নেমে এসেছে সন্ত-আশ্রমের ধরাধামে। মায়ের এই রূপটি শুধু মনে প্রাণে করা যায় অনুভব—মায়ের আশীর্ব্বাদে!

বিকাল তিনটায় আরম্ভ হোল বাচ্চাদের খেলাধূলার প্রোগ্রাম। আমাদের মাও যে বাচ্চাদের সাথে সমান উৎসাহী—মনে হচ্ছিল, মা যেন শিশু হয়ে বাচ্চাদের সাথে মিশে গিয়েছেন। মায়ের সামনে রেস দেবার উৎসাহে বাচ্চারা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিলো—মনে হচ্ছিল, শ্রীমাও যেন ওদের সাথে ছুটবার জন্যে অধীর। গাম্ভীর্য্যের সাথে ছোট্ট শিশুসুলভ আনন্দ মিশ্রিত হয়ে মায়ের মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত। আবার মাঝে মাঝে যেসব বাচ্চারা মুখ দিয়ে বিস্কুট বা জিলাপী নিতে পারছিলো না—জিলাপী-বিস্কুট রেসে—ওদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে বল্‌ছেন—ওরে, ওরা পারছে না রে—ওদের মুখে বিস্কুট ও জিলাপী ছিঁড়ে দে রে। কেউ একটু আঘাত পেলে মনে হচ্ছিল, সব রকম আঘাতই মা যেন বুক পেতে নিচ্ছেন!

মাগো! তোমার এ রূপদর্শনে আমরা ধন্য—বিশ্বজননীর চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণতি।

সন্ধ্যায় আমার আশ্রমের বোনেরা সবাই অন্তরের শ্রদ্ধায় মাতৃগীতি পরিবেশন করে সেদিনকার উৎসব সমাপ্ত করেন।

(ঝ)

২২শে ফেব্রুয়ারী—শান্ত, স্তব্ধ ও একনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে উদয়াস্ত-জপ প্রতিপালিত হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১০ই ফাল্গুন, সেদিন ছিলো শিবরাত্রি ; সেদিন উৎসবের অঙ্গ ছিলো উদয়াস্ত—গীতাপাঠ। সন্ধ্যায় ব্রজধামে, মাতৃসান্নিধ্যে ও মাতৃ-সমভিব্যাহারে, সবাই অঞ্জলি প্রদান করলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরজীর চরণে—পবিত্র শিবরাত্রি-ব্রত উপলক্ষ্যে। তারপর সমস্ত স্তব্ধতা ভেদ করে ও সবাইকে উদ্দেশ্য করে ভেসে উঠলো—মায়ের বাণী—টেপ-রেকর্ডারে। শ্রীশ্রীমায়ের কথা তো নয়—যেন অমৃত-সুধাধারা—সহজ সুরের সুললিত সঙ্গীতের মতন মনের প্রান্তে এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—যার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে যেতে লাগলো ঊর্দ্ধলোকের মনোময় জগতে !

মাগো ! তুমি তো আমাদের সব কিছুই বিলিয়ে—উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে বসে আছ। তোমার একটি বাণীও যদি আমরা নিজেদের জীবনে প্রতিপালন করতে পারি—তবেই আমরা আমাদের মায়ের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারবো।

মাগো ! দাও আমাদের সহজ সরল বিশ্বাস—দাও আমাদের তাঁকে পাওয়ার ব্যাকুলতা—জানিয়ে দাও তিনিই একমাত্র আপনজন ও জীবনে এত আপন আর কেউ নন। তাঁকে আমার চাইই চাই !

মাগো ! সেই মনশ্চক্ষু দান করো—যে চোখ, যে মন পায় অহরহ পরম-গুরু করুণাময় ভগবানের দর্শন—আমরা যে চোখ থাকতেও অন্ধ—তাইতো মনে হয়—

ভগবান ! কোথা তোমায় খুঁজি অনুক্ষণ ?
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি দেখিতে না পায় মন।

তুমি আমাদের কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদই করো মা জননী—অন্তর ও বাহির যেন তাঁকে নিয়েই পূর্ণ হতে পারি।

(ঞ)

২৪শে—২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১১ই-১২ই ফাল্গুন। ধর্ম্ম-আলোচনার সভা। এই সভাতে বহু জ্ঞানী, গুণী ও শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষদের সমাবেশ হয়। সব আলোচনার মধ্যে একটি কথাই নিহিত ছিলো—সদ্‌গুরু লাভ না হলে পরম শ্রেয়কে পাওয়া যায় না। এসব আলোচনা শোনার পর মন আমার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো—আমার কি হবে? আমি কেমন করে সদ্‌গুরু লাভ করবো—কে আমায় পথ দেখাবে? মনটা আমার কেমন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো।

সন্ধ্যায় আশ্রমিকা-বোনেরা আনন্দে পরিবেশন করলেন—নৃত্যের মাধ্যমে "ঝুলন কীর্ত্তন"—ব্রজধামে রচিত হয়েছে সুন্দর হিল্লোল! রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের ভূমিকায় প্রত্যেকের নৃত্য এত প্রাণবন্ত হয়েছিল যে সত্যিই তখন মনে হচ্ছিল—সেই বৃন্দাবন নেমে এসেছে ব্রজধামের নাটমন্দিরে—ভক্তপ্রাণ লীলাময়ের প্রত্যক্ষ লীলা দর্শনে আনন্দে বিভোর হয়েছিল!

সেদিন রাতে আমি সন্ত-আশ্রমে ছিলাম—শ্রীশ্রীমা আমাকে তিনদিন আশ্রমে থাকতে বলেছিলেন। রাতে শয্যা নিয়েও মনের অস্থিরতা গেলো না—কে আমাকে পথ দেখাবে? ব্যাকুলভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর শরণ নিলাম—কৃপা করো প্রভু, কৃপা করো আমায়—পথ দেখাও! এক গভীর চিন্তা নিয়ে সারারাত কেটে ঊষার আলো ফুটে উঠলো।

(ট)

মাতৃ-কৃপালাভ

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৩ই ফাল্গুন—ভোরে মঙ্গলারতিতে যোগ দিতে গেলাম ব্রজধামে—কিন্তু মনের অস্থিরতায় সেখানে বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না। দোতালায় মাতৃধামে এসে বসলাম। মন গভীর চিন্তাচ্ছন্ন—হঠাৎ মনে কে যেন এক পরম শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল—

'আরে, বোকা মেয়ে—তুই তো সব সময় মা! মা! করিস্—তোর আবার চিন্তা কিসের? তাঁর কাছেই তোর সমস্যা নিবেদন করে—তাঁরই শরণ নে না!' বিদ্যুৎস্পর্শের মতন কথাটা যেন আমার সারা অন্তরে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু, কি করি—শ্রীশ্রীমা তখনও ঘরেই আছেন—মাতৃধামে এসে বসেন নি। এসে বসলে আবার আমার সমস্যাটা সবার সামনে জানাতেও সঙ্কোচ!

উপায় যাঁর কোরবার তিনিই করে দিলেন। ব্রহ্মচারিণী সন্ধ্যা দেবী তখন মাতৃধামে এলেন। আমি মাকে একটা কথা জানাতে চাই শুনে, মায়ের ঘরে গেলেন ও এসে আমায় নিয়ে গেলেন। সত্যিই বলছি, এই যোগাযোগ হওয়াতে শ্রদ্ধায় ও আনন্দে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিলো।

শ্রীশ্রীমা গভীর স্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কিছু বলবে আমায়?"

আমি বোল্লাম—মাগো! রোজই শুন্ছি—সদ্গুরুলাভ না হলে পরমব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। তবে, আমার উপায় কি হবে বল?

অপার করুণাময় মা বল্লেন—"আচ্ছা, আজ গঙ্গাস্নানের পর তোমায় যা দেবো—তুমি তাই নিও।"

আমি কি জানতাম—আমার সদ্গুরু কৃপা করে দু'হাত বাড়িয়ে আছেন—আমায় পরম অভয় দিয়ে বুকে টেনে নিতে! সুকৃতি আমার কিছু আছে কিনা জানিনা—জানেন আমার কল্যাণময়ী মা। মনে মনে শুধু বলি—"ধন্য মা, তুমি ধন্য—অভাগাজনেরে করুণা বিতরি জীবন করেছ পূর্ণ।"

মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ব্রজধামে গিয়ে—মনে মনে তাঁরই চরণে লুটিয়ে দিলাম নিজেকে—আর প্রার্থনা কোরলাম—"তোমারি কৃপায়, তোমায় যেন পাই প্রভু।"

সকাল ৮টায় আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সাথে পুণ্যতোয়া গঙ্গাজীতে স্নান করে শুদ্ধ দেহে, শুদ্ধ মনে, বিশ্বনাথজীকে প্রণাম করে আশ্রমে ফিরে এলাম। বিশ্বনাথ-মন্দিরে পাণ্ডাজী, আমি না চাইতেই, একটি প্রসাদী মালা আমাকে দিলেন।

আশ্রমে এসে মায়ের ডাকে তাঁর ঘরে গেলাম। কিন্তু, কি করতে হবে না

(ঞ)

২৪শে—২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১১ই-১২ই ফাল্গুন। ধর্ম্ম-আলোচনার সভা। এই সভাতে বহু জ্ঞানী, গুণী ও শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষদের সমাবেশ হয়। সব আলোচনার মধ্যে একটি কথাই নিহিত ছিলো—সদ্‌গুরু লাভ না হলে পরম শ্রেয়কে পাওয়া যায় না। এসব আলোচনা শোনার পর মন আমার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো—আমার কি হবে? আমি কেমন করে সদ্‌গুরু লাভ করবো—কে আমায় পথ দেখাবে? মনটা আমার কেমন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো।

সন্ধ্যায় আশ্রমিকা-বোনেরা আনন্দে পরিবেশন করলেন—নৃত্যের মাধ্যমে "ঝুলন কীর্ত্তন"—ব্রজধামে রচিত হয়েছে সুন্দর হিল্লোল! রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের ভূমিকায় প্রত্যেকের নৃত্য এত প্রাণবন্ত হয়েছিল যে সত্যিই তখন মনে হচ্ছিল—সেই বৃন্দাবন নেমে এসেছে ব্রজধামের নাটমন্দিরে—ভক্তপ্রাণ লীলাময়ের প্রত্যক্ষ লীলা দর্শনে আনন্দে বিভোর হয়েছিল!

সেদিন রাতে আমি সন্ত-আশ্রমে ছিলাম—শ্রীশ্রীমা আমাকে তিনদিন আশ্রমে থাকতে বলেছিলেন। রাতে শয্যা নিয়েও মনের অস্থিরতা গেলো না—কে আমাকে পথ দেখাবে? ব্যাকুলভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর শরণ নিলাম—কৃপা করো প্রভু, কৃপা করো আমায়—পথ দেখাও! এক গভীর চিন্তা নিয়ে সারারাত কেটে উষার আলো ফুটে উঠলো।

(ট)

মাতৃ-কৃপালাভ

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৩ই ফাল্গুন—ভোরে মঙ্গলারতিতে যোগ দিতে গেলাম ব্রজধামে—কিন্তু মনের অস্থিরতায় সেখানে বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না। দোতালায় মাতৃধামে এসে বসলাম। মন গভীর চিন্তাচ্ছন্ন—হঠাৎ মনে কে যেন এক পরম শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল—

'আরে, বোকা মেয়ে—তুই তো সব সময় মা! মা! করিস্—তোর আবার চিন্তা কিসের? তাঁর কাছেই তোর সমস্যা নিবেদন করে—তাঁরই শরণ নে না!' বিদ্যুৎস্পর্শের মতন কথাটা যেন আমার সারা অন্তরে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু, কি করি—শ্রীশ্রীমা তখনও ঘরেই আছেন—মাতৃধামে এসে বসেন নি। এসে বসলে আবার আমার সমস্যাটা সবার সামনে জানাতেও সঙ্কোচ!

উপায় যাঁর কোরবার তিনিই করে দিলেন। ব্রহ্মচারিণী সন্ধ্যা দেবী তখন মাতৃধামে এলেন। আমি মাকে একটা কথা জানাতে চাই শুনে, মায়ের ঘরে গেলেন ও এসে আমায় নিয়ে গেলেন। সত্যিই বলছি, এই যোগাযোগ হওয়াতে শ্রদ্ধায় ও আনন্দে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিলো।

শ্রীশ্রীমা গভীর স্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কিছু বলবে আমায়?"

আমি বোল্লাম—মাগো! রোজই শুন্‌ছি—সদ্‌গুরুলাভ না হলে পরমশ্রেয়কে পাওয়া যায় না। তবে, আমার উপায় কি হবে বল?

অপার করুণাময় মা বল্লেন—"আচ্ছা, আজ গঙ্গাস্নানের পর তোমায় যা দেবো—তুমি তাই নিও।"

আমি কি জানতাম—আমার সদ্‌গুরু কৃপা করে দু'হাত বাড়িয়ে আছেন—আমায় পরম অভয় দিয়ে বুকে টেনে নিতে! সুকৃতি আমার কিছু আছে কিনা জানিনা—জানেন আমার কল্যাণময়ী মা। মনে মনে শুধু বলি—"ধন্য মা, তুমি ধন্য—অভাগাজনেরে করুণা বিতরি জীবন করেছ পূর্ণ।"

মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ব্রজধামে গিয়ে—মনে মনে তাঁরই চরণে লুটিয়ে দিলাম নিজেকে—আর প্রার্থনা কোরলাম—"তোমারি কৃপায়, তোমায় যেন পাই প্রভু।"

সকাল ৮টায় আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সাথে পুণ্যতোয়া গঙ্গাজীতে স্নান করে শুদ্ধ দেহে, শুদ্ধ মনে, বিশ্বনাথজীকে প্রণাম করে আশ্রমে ফিরে এলাম। বিশ্বনাথ-মন্দিরে পাণ্ডাজী, আমি না চাইতেই, একটি প্রসাদী মালা আমাকে দিলেন।

আশ্রমে এসে মায়ের ডাকে তাঁর ঘরে গেলাম। কিন্তু, কি করতে হবে না

হবে, আমি কিছুই জান না। সকল চিন্তার মালিক শ্রীশ্রীমা নিজেই আমায় জানিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন, অতি স্নেহভরে। অপার্থিব আনন্দরসে পূর্ণ করে দিলেন।

আমার পরমগুরু শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিটি বাচনভঙ্গি, শব্দ ও স্নেহস্পর্শ আমার সমস্ত দেহে ও অন্তরে অপার্থিব, অজানা আনন্দের শিহরণ দিয়ে গেল!

মা বল্লেন—"তুমি ব্রজধামে বসে ধ্যান করে, ১০৮ বার জপ করে নাও।"

শ্রীশ্রীমায়ের মধুর আদেশে আমি নীচে নেমে ব্রজধামে গেলাম। সারাদিন আমার সেই ভাবের আবেশে কেটে গেলো—স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে বসে, এক পরম আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম!

মাগো! আমার সেই অবস্থা একমাত্র তুমিই জানো—তুমি যে অন্তর্য্যামী! অসীম করুণায় তুমি তোমার এই অযোগ্যা মেয়েটিকে যে অমৃতে ভরে দিয়েছ, সেই অমৃতে তার জীবন অমৃতময় করে তোল—সেই অমৃতের স্রোত ফল্গুধারার মতই তার অন্তরে নীরবে ও নিভৃতে যেন প্রবাহিত হয়—তোমার আশীর্ব্বাদে—তোমার চরণে এই মিনতি ও প্রার্থনা!

(৬)

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৪ই ফাল্গুন—অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তনের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমার স্নেহের আশ্রমের বোনেরা ও দিদিরা যেন উদ্দীপ্ত! কর্ম্মক্লান্ত সন্তানদের জন্যে মায়ের মন উদ্বিগ্ন। বলছেন—তোমরা অষ্টপ্রহর না করে উদয়াস্ত নামকীর্ত্তন করো। তারা প্রার্থনা জানালেন—মাগো, আমরা অষ্টপ্রহর করবো, তুমি অনুমতি দাও—আর দাও শক্তি আমাদের!

শ্রীমা বল্লেন—আচ্ছা, তাই হবে। বোনেদের আনন্দ ধরে না!

মাগো! জগৎ-জননী! তোমার কৃপাতে ওরা ধন্যা! প্রতিদিন যে শক্তি ওদের সঞ্চারিত করে দিচ্ছ, তারই প্রেরণায় ওরা চলেছে, দুর্ব্বারশক্তির গতিতে—যে দুর্ব্বার শক্তির টানে বিশ্বজগতও চল্‌ছে!

সেইদিন বিকাল ৪টায় ব্রজধামে উদ্‌যাপিত হোল—ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রীতির নিদর্শন—রাখী-বন্ধন উৎসব। বড় ভাল লেগেছিল এই উৎসবটি আমার।

আশ্রমিকা বোনেরা সব ভাই-বোনদের হাতে বেঁধে দিলেন রাখী—শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে। মা যে মহা-আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে দিলেন সবাইকে এক সাথে। এ রাখী প্রাণের বন্ধন, মনের বন্ধন; বিরাট এক আশ্রয়ের তলে সকলে বন্দী হোল মহাবন্ধনে! একজনও এই রাখীবন্ধন থেকে বাদ পড়েনি—সবারই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল—সবাই আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে রাখীর মহাবন্ধনে বাঁধা পড়তে। বড়ই উপভোগ্য ও আনন্দপূর্ণ হয়েছিল রাখীবন্ধন উৎসবটি। যে রাখী আমাদের হাতে বাঁধা হোল, তার প্রতিটি তৈরী মায়েরই এক একনিষ্ঠ ভক্তের অন্তরের নিষ্ঠায়—এর মূল্যই যে আলাদা!

মনে-প্রাণে, জন্ম-জন্মান্তরে, এই পবিত্র রাখীর বন্ধনে আমরা যেন বাঁধা থাকতে পারি—জগৎজননী! আজ তুমি আমাদের এই আশীর্ব্বাদই করো—পরমগুরুর পরম বন্ধনে আসুক পরম মুক্তি মোদের জীবনে!

(ঙ)

মায়ের লীলা-মাধুরী

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফাল্গুন—১৫ দিন ব্যাপী মহোৎসবের আজই শুভ-সমাপ্তি। এই দিনগুলি আনন্দ-হিল্লোলের প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে অতিবাহিত হোল।

ভোর ৪-২০ মিনিটের সময় মায়ের আগমনীর প্রভাতী গান গেয়ে পথ-পরিক্রমা আরম্ভ হয়, তারপর অনুষ্ঠিত হয় সমবেত মাতৃ-অঞ্জলি।

"জয় শ্রীশ্রীশোভা-মা"—"জয় মা! জয় মা!" করে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত মায়ের জয়ধ্বনিতে, প্রাণের আবেগে সব কাজই সহজ সরল হয়ে যাচ্ছে।

দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে—বেনারসে থেকেও, দূরে ছিলাম বলে, অতি মহনীয় এই দু'টি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

সকালে যখন আশ্রমে এলাম—তখন ব্রজধামে মাতৃলীলা-কথা আরম্ভ হয়েছে। শ্রীশ্রীমাও সেখানে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে, ব্রজধামের ভিতরে যেয়ে বসলাম। আজ আমি আমার জীবনে মায়ের অপূর্ব্ব লীলা-কথা বলে, উৎসবের কথাগুলি শেষ করবো।

আমার প্রাণের দরদী—চির অমৃতময়ী মায়ের শরণ নিলাম—"জয় মা।"

শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ব্বাশ্রমের গুরুজনেরা ও মায়ের সন্তানেরা তাদের অতি প্রিয় মায়ের অপূর্ব্ব লীলার কথা—গভীর আবেগে, অশ্রুপূর্ণলোচনে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পরিবেশন করছিলেন—সকলে অভিভূত হয়ে শুনছিলেন। মন মগ্ন; একবার শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর দিকে, আর একবার শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। দেখ্‌ছিলাম কৃপাময়ী 'মাকে'—সূক্ষ্ম অম্লান হাসিতে মুখ পরিপূর্ণ—যেন ওখানে উপস্থিত থেকেও, অন্য কোন সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করছেন!

অপূর্ব্ব রক্তিম বেশে সজ্জিত সেদিন—রাধাবিহারীজী ও রাধারাণী। যুগল-বিগ্রহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন যেন কিসের একটা তন্ময়তায় ডুবে যাচ্ছিল। একটা অদ্ভুত সুগন্ধের আবেশে মন আচ্ছন্ন—মায়ের লীলাকথা কিছু কানে আস্‌ছিল, কিছু আসছিল না—হঠাৎ, চোখে ভেসে উঠ্‌লো শ্রীশ্রীঠাকুরজীর এক অপরূপ রূপ! অম্লানশুভ্র শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হয়েছে উজ্জ্বল কালো মসৃণ কষ্টিপাথরের বিগ্রহে। মাথায় সোনার মুকুট, তারি মাঝে শোভা পাচ্ছে ময়ূর-পুচ্ছ। মধুর মৃদু হাসিতে মুখখানি পূর্ণ। অতি অপরূপ—নয়ন-ভুলানো মনোহর মূর্ত্তি। নীলনবঘনশ্যামল মনোহর-বঙ্কিমঠামে—বংশীধারী রাধাবিহারীজী বিরাজমান!

জাগ্রত অবস্থায় দর্শন—এও কি সম্ভব? সমস্ত দেহমন আমার অধীর আবেগে থরথর করে কাঁপছিলো। শ্রীগুরুকৃপা-স্মরণে নয়ন হোল অশ্রুপূর্ণ। জীবন-নয়ন আমার সার্থক—মনে হোল, গুরুর আশীর্ব্বাদে সবই সম্ভব। তিনি কৃপা করলেই তাঁর লীলাময় জগৎ—তাঁরই লীলাময় ছন্দ—প্রতি পদক্ষেপেই অনুভূত হয়। পরমগুরু আমাদের অন্তরেই সমাসীন হয়ে প্রতিটি কাজ স্নেহের

সাথে করিয়ে নেন। পরমগুরুর কৃপা হলে অন্তরে উপলব্ধি হয় যে এক মুহূর্ত্তও তিনি আমাদের ছাড়া নন। কোথায় খুঁজি তাঁরে দূরে—তিনি যে আমাদের অন্তরের অন্তরতম—আমাদের অন্তরেই চির প্রতিষ্ঠিত—শুধু, রাখতে হবে সদ্‌গুরুর পায়ে অখণ্ড বিশ্বাস!

তাইতো মনকে বলি—ওগো মন, বিশ্বাস করে ধন্য হও—সুপ্ত মন, ওঠো জাগো— সুন্দরের পরশে নিজেকে সুন্দর করে নাও!

মাগো! দাও আমারে সহজ সরল বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের দৃঢ়মূল তোমারই স্নেহ-উৎসধারায় করে রাখে সঞ্জীবিত—স্নেহ ও বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ!

আজ শ্রীশ্রীমায়ের যে লীলার কথা অন্তরের গভীর সত্যে উপলব্ধি কোরলাম —এর সত্যমিথ্যা একমাত্র শ্রীশ্রীমাই বলতে পারবেন—তাই আমার স্নেহময়ী জননীর শরণাপন্ন হোলাম।

সেদিনই বিকালে—মায়ের অনুমতি নিয়ে, কোলকাতা ফিরবার জন্যে রওনা হোলাম—আমার পরমগুরু শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণত হয়ে। মায়ের অদর্শনের বিরহ-ব্যথায় সারা অন্তঃস্থল মথিত হচ্ছিল। তবুও আমার স্নেহময়ী ঈশ্বর-রূপিণী মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এলাম—অপার অপার্থিব আনন্দ ও জীবনপথে চলার সম্বল ও পাথেয়! আনন্দময় মনোজগতে—আমার মায়ের আশীর্ব্বাদ রইলো ভরে। যতদূর দৃষ্টি যায়, যাত্রাপথ শ্রীশ্রীমায়ের বরাভয়-হস্ত-সঞ্চালনে শুভ ও সুগম হয়ে উঠলো।

শুভদা, বরদা, কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি অন্তরের গভীরে ধারণ করে যাত্রাপথে অগ্রসর হোলাম। সারা পথ মনে হোল, শ্রীমা তো দূরে নেই—তিনি তো আমাদের সাথে, আমাদের মাঝেই রয়েছেন। সংসারের ভুল-ত্রুটি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা—সর্ব্বপ্রকার চিন্তাধারার মাঝে, সর্ব্বযুগের, সর্ব্বকালের সাথী হয়ে বিরাজমান!

মাগো! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? মা-মা বলে কেঁদে কেঁদে ফিরেছি

—আজ সময় হয়েছে—তুমি ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিয়েছ—আর তুমি আমায় ছেড়ে যেও না!

মাগো! দিনের পর দিন তোমাকে দেখে এই কথাই মনে হয়েছে—তোমার কর্ম্মদক্ষতা, তোমার কর্ম্মপ্রেরণা, তোমার কর্ম্মশক্তি, তোমার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, তোমার সেবাধর্ম্ম, সন্তানদের জন্যে তোমার উদ্বেগ, চিন্তা-ভাবনা, তোমার আনন্দ-উচ্ছ্বাস, তোমার খুশী, তোমার শাসন, তোমার উপদেশ—সব মিলিয়েই জানিয়ে দিচ্ছে—আধ্যাত্মিক জীবনের মাঝেই আছে সহজ সরল জীবন, যে জীবনকে তুমি ধর্ম্মের মুখোস দিয়ে ঢেকে দাওনি—দাওনি তাকে বিকৃত করে। তুমি তোমার নিজের আচরণ দ্বারাই পরমগুরুর সাথে মহা-মিলনের পথ নির্দ্দেশ করেছ!

মাগো! তোমার শুচিতা, তোমার পবিত্রতা, তোমার অবিচল গুরুভক্তি ও নিষ্ঠা দেখলে বিস্মিত হতে হয়! তুমি যে তোমার গুরুজীর কাছেই সবকিছু সমর্পণ করে, নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছ! বাবাজী মহারাজ তোমার কাছে শুধু গুরুদেবই নন—জগৎগুরু—তোমার ইহকাল, পরকাল, যথাসর্ব্বস্ব! গুরুজীর প্রতি অসীম নির্ভরতা তোমার প্রতিটি কথায় ও বাণীতে। তোমার চলার আলপনা-চিহ্নিত পথেই কত স্নেহভরে তুমি আমাদের পথের সঙ্কেত দিয়ে রেখেছ!

মাগো—অনন্তস্রোতের মাঝে তুমি প্রস্ফুটিত সহস্রদল-পঙ্কজিনী—শত শত পাপড়ি মেলে তুমি নিজেকে বিস্তারিত করে রেখেছ শত সহস্র কর্ম্মের মধ্যে। তোমার সহস্রদল কমলে পদ্মমধুর সুগন্ধে—কত মধুকরই তো তোমার পাশে ভিড় করেছে—কিন্তু, করোনি তো তুমি কাউকে বিমুখ—তোমার অন্তর-কোকনদের অমৃত তুমি বিলিয়ে দিচ্ছ প্রতি জনে জনে!

আমি সাধনহীন, ভজনহীন, জ্ঞানহীন—তোমার চরণে দাও আমায় আশ্রয়। তোমার কৃপাতে, তোমার চরণে আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ হউক। তোমার সন্তান আমি—সেই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়!

তোমার দেওয়া ভাবে পূর্ণ মন এই অধ্যায়টি সমাপ্ত করেছে। ভালমন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি—সে তুমি জান 'মা'।

তোমার পায়ে রইলো আমার অন্তরের যুগযুগান্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা ও প্রণাম।

৮

ওঁমা

স্বপ্নে মায়ের লীলা-কৃপা-আশিস্

বেনারস থেকে ফিরে এসে মাকে নিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে রইলাম। সব সময়েই মনে মা-মা চিন্তা, মা-মা ধ্যান ও মায়ের নাম স্মরণ করেই সময় কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ, একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—শুয়ে আছি, শ্রীশ্রীমা এসে জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তিতে শিয়রে দাঁড়িয়ে আমার ব্রহ্মতালুতে হাত রাখলেন। মায়ের স্পর্শ-মাত্রই মনে হতে লাগলো—আমার মাথা থেকে সারা শরীরের মধ্যে একটা আলোড়ন করে—কি জানি কতগুলি ভারী, গাঢ়, ধোঁয়ার মতন পদার্থ, আমার পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো আর আমার সমস্ত দেহ ভার-মুক্ত হয়ে হালকা থেকে হালকাতর হতে লাগলো ও সুগন্ধে ভরে যেতে লাগলো। মনে হোল, আমার সারাদেহ এত হাল্কা হয়ে গেলো যে আমি আস্তে আস্তে উপরে ভেসে উঠ্‌ছি। আমার এই অনুভূতি কি করে বোঝাব জানি না।

মায়ের উপস্থিতিতে অগাধ বিস্ময়ের মাঝে জড়িয়ে রইলো এই অনুভূতি। জেগে উঠলাম। অনুভব কোরলাম, তক্ষুনি কেউ আমার মাথার কাছ থেকে সরে গেলেন—আলোর কিয়দংশ দেখতে পেলাম।

ঘোর কাটতেই দেখলাম—আমি তো নিজের ঘরেই শুয়ে রয়েছি—কিন্তু স্বপ্ন কি এত সত্যি হতে পারে—দেহে তখনও যেন সুগন্ধ বোধ করছি। স্বপ্নের আমার মনের চিন্তা-ভাবনাগুলি মাকে লিখে জানাতে, মা লিখলেন—

"তোমার দেহে যেটুকু দোষ ও ময়লা ছিল তাঁর ইচ্ছাতে সমস্ত অপসৃত হয়ে গেছে। তাই, তোমার শরীরের ঐ অবস্থা অনুভূত হয়েছে। মনকে শান্ত করে ধ্যান করে যাও।"

জয় মা জয়! তোমার এই অভাবনীয় কৃপার পূর্ণ মর্য্যাদা যেন দিতে পারি তোমারই আশীর্ব্বাদে। আমার মতন অভাজনকে করলে তুমি দয়া। মাগো! তোমার দয়া, তোমার কৃপা সবার উপর বর্ষিত হউক—এই প্রার্থনাই তোমার চরণে করি।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে কিছুই করতে পারি না—তবু ও, কি ভাবে কেমন করে যে সব হয়ে যায়—কে যে হাত ধরে সব করিয়ে নিচ্ছেন—নিজেই বুঝতে পারছি না। অন্তঃস্থল থেকে স্বতস্ফুরিত মায়ের দেওয়া নামের ধ্বনি উঠছে—মনে হচ্ছে, আমি নিজে কিছুই করতে পারছি না—শ্রীশ্রীমাই যেন আমাকে স্পর্শ করে অন্তরে বসে নামের ধ্বনি দিচ্ছেন। মায়ের সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ স্বর আমার দেহ-মনে ছড়িয়ে যাচ্ছে—আমি যেন তদ্‌গত হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সাথে নাম করে যাচ্ছি। মা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, এই অবোধ মেয়েটিকে তিনি নিজে না করিয়ে দিলে তার শক্তি কোথায়?

মাগো! ছোট্ট শিশুর মতন তোমার কাছে রেখে দাও মা—তাদের মতই যেন নির্ব্বিচারে তোমার কোলে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি—তুমি চাইলেও, না চাইলেও; কোলে একবার ঝাঁপিয়ে পড়লে তুমি তো আর ফেলতে পারবে না, মা! তাইতে, তোমায় মাঝে মাঝে বলি—

ছোট্ট শিশুর মতন করে দাও আমারে—কাজ নেই মোর জ্ঞান-বিচারে।

যখন দেখি ছোট্ট বাচ্চারা তোমার কোলে উঠে আদর কাড়ে, তখন আমার মনেও সেই ছোট্ট শিশুটী হয়ে তোমার আদর পাবার প্রবল ইচ্ছা জাগে। তাই তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই—আমায় শিশুর মতন সরল ও ছোট্টটি করে দাও মা—তাদের মতন সর্ব্বদা মা-মা করে ডেকে তোমায় ব্যস্ত রাখতে পারি, তোমার আশীর্ব্বাদে। আমার অন্তরের মিনতি ও প্রণতি গ্রহণ কোরো।

৯

কত কিছুই লিখে চলেছি—ভাব-ভাষা, ভাল-মন্দ, কিছুই জানিনা—জানেন শুধু মা। মায়ের কথায় যে নৈবেদ্য সাজাতে চাইছি—মনের আবেগে ও প্রাণের ধ্বনিতে—তার প্রকাশের ক্ষমতা, অক্ষমতাও আমি জানি না—শুধু জানি, মা যে স্নেহময়ী, করুণাময়ী—সন্তানের ভাল-মন্দ পূজার নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করলেই—নৈবেদ্য একমাত্র হয়ে উঠতে পারে প্রাণবন্ত, মায়ের প্রসাদে—নইলে, সব বৃথা !

বেনারস থেকে সু'মণির চিঠি পেলাম—মায়ের শ্রীদেহ ভাল যাচ্ছে না, এ জন্যে সবারই মন খারাপ—চিকিৎসকরা ঠিক মত কোন কিছুই ধরতে পারছেন না।

১৯৭১ মে মাসের শেষের দিকে শ্রীশ্রীমা কল্যাণীতে এলেন গুরুপূর্ণিমা-উৎসব উপলক্ষ্যে। তখনও উৎসবের দেরী ছিলো—শ্রীশ্রীমায়ের সাথে দেখা করে প্রণাম জানাতে কল্যাণী গেলাম। দেখ্‌লাম মায়ের প্রফুল্ল হাসিটি মুখে লেগেই রয়েছে। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা কোরলাম—'মাগো কেমন আছো ?'

মুখ-ভর্ত্তি হাসি নিয়ে উত্তর দিলেন মা—'ভাল আছি, তুমি কেমন আছো ?'

জানি, ভালমন্দ সবই মায়ের কাছে একাকার—দেহ নিয়ে এলে দেহের ভোগ সহ্য করতেই হবে। সন্তানগত-প্রাণা মা সন্তানদের মঙ্গল কামনায়—আকুল ভাবে, অণুপরমাণু দিয়ে, নিজের উপরে নিয়ে নিচ্ছেন—সন্তানদের ভোগ। তাই, মায়ের দেহে ও কিছুটা নিতে হয় বৈকি ! তারপর সন্তানদের শিক্ষার জন্যে—দেহের কষ্ট উপেক্ষা করে ও যে আনন্দকে আঁকড়ে ধরে দেহের যাতনাকে তুচ্ছ করতে হয়—সেই দৃষ্টান্তও শ্রীশ্রীমা নিজের দেহের ভোগের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

আজ পর্য্যন্ত মায়ের মুখে শুনিনি তাঁর শ্রীদেহের কোন কষ্ট আছে—আপন কাজে কোন ক্লান্তি আছে—সব সময়ই জিজ্ঞাসা করলে একই উত্তর পাওয়া যায়—'ভাল আছি।'

এখানে ভাইদার চিঠির মাধ্যমে একটি সুন্দর উক্তি রয়েছে মায়ের কাছে—"সেদিন কল্যাণী আশ্রমে তোমার অসুখের খবর নিতে গেলে তুমি ও বলেছিলে—'ভাল আছি'। হ্যাঁ, তোমরা ভালই থাক। বাবা ও থাকতেন—তুমি ও থাক। আমরা কিন্তু, কোন অবস্থায়ই ভাল থাকি না।"

মাগো! অযাচিতভাবে সন্তানদের কত কিছুই তুমি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছো—তুমিই তাদের অজ্ঞানতার ঠুলি খুলে দিয়ে চোখের আঁধার ঘুচিয়ে দিও মা।

কল্যাণীতে এসেও মায়ের স্থূলদেহের কষ্ট আবার আরম্ভ হোল। মায়ের উপর ভরসা করেই মায়ের কাছে এক আর্জ্জি পাঠালাম চিঠিতে—"এখানে তোমার ভাল সার্জ্জেন ডাক্তার দেখাতেই হবে।" মায়ের জোরেই আমার জোর—না হলে আমার কি জোর করে দাবী করা চলে? ছোট্ট মেয়ে যেমন আব্দার করে, অবুঝ হয়—আমি ও তাই কোরলাম।

চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে একদিন সকালে মায়ের কাছে যেয়ে উপস্থিত হোলাম।

মা কি বলবেন তাই ভাবছি—মা কিন্তু আমার আর্জ্জির চিঠি সম্বন্ধে একেবারে নীরব—নিজের থেকে কিছু বলছেন না। তখন কি করি? মরিয়া হয়ে চিঠির কথা তুলতেই—মায়ের সেই বিশ্বভুবন-ভোলান হাসি। কিছু যেন অভয় পেলাম। কত যেন অসহায়ভাবে বল্লেন মা—

'আচ্ছা, চাইছো যখন, তখন হবে—তবে, কিন্তু, আমার ডাক্তার ছেলেকে ছাড়া অন্য কোন সার্জ্জেন দেখাবো না।'

মা তাঁর ছেলের নাম করলেন। নাম শুনে থাকলেও আমার সাথে তার পরিচয় ছিলো না। বল্লাম—তোমার আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছা হলে তাই হবে মা।

আমি যতদিন কল্যাণী গিয়েছি মায়ের ডাক্তার ছেলেকে কখনও দেখিনি। তাই, মনে একটু সঙ্কোচ নিয়ে—নাম্বার দেখে ফোন কোরলাম ও তাকে শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা জানালাম।

ডাক্তারসাহেব বল্লেন,—'আপনি যদি নিয়ে যান, তবে যেতে আমার কোন

আপত্তি নেই—শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-দর্শন ও হবে।' আমরা যাবার সময় ও তারিখ ঠিক করে নিলাম।

নিয়ে যাবার মালিক আমি নই—যোগাযোগ যিনি কোরবার তিনি আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সময়মত মায়ের ডাক্তার-ছেলের বাড়ী গেলাম—সেই প্রথম আমার চাক্ষুষ পরিচয়—সঙ্গে তার স্ত্রীও মেয়ে ছিলেন। দেখলাম ডাক্তার-সাহেব মায়েরই ছেলে—সদা আনন্দময় হাসি-খুশী ও কৌতুক-প্রিয় মানুষটি। এখন অবশ্য ডাক্তার-দাদাকে বড় আপন জন বলে মনে হয়। সারাপথ নানা আলাপ-আলোচনার মধ্যে কাটছিলো। তার মধ্যে ডাক্তার-দাদার একটি মনোভাব আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন—

"আমরা ডাক্তার, মহাসাধক ও মহাসাধিকার নাড়ীর গতি বোঝা আমাদেরও সাধ্য নয়—যদি তাঁরা কৃপা না করেন—ধরা না দেন। সাধারণ মানুষের থেকে এঁদের নাড়ীর গতি ভিন্ন—দেখি মা কি করেন, এই ছেলেকে যদি বুঝতে দেন।"

কল্যাণীতে সন্ত-আশ্রমে যখন পৌছালাম তখন সাগ্রহে সবাই ডাক্তারদাদার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

"মা! ছেলেকে কৃপা করে বুঝতে দিও।"—ডাক্তার-দাদার কথায় মায়ের সেই উদ্বেলিত, স্নেহপূর্ণ, উচ্ছ্বসিত হাসি হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেয়ে দোলা দিল—সেই হাসির রূপ জীবনে কোনদিনই ভুলবার নয়!

মায়ের ঘরে মায়ের স্থূলদেহ (শ্রীদেহ) পরীক্ষা করে ডাক্তার-দাদা হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন—ততোধিক হাসি-মুখে বেরিয়ে এলেন 'মা-মণি'। বললেন—

"তোমরা খামকা ব্যস্ত হয়েছো। জানি তো আমার কিছুই রোগ পাওয়া যাবে না—এবার তোমরা নিশ্চিন্ত তো!"

মনের সংশয় আমার মায়ের কথায় শান্ত হল না—ডাক্তার-দাদার সাথে কথা বলবার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

মায়ের আদরে ও শ্রীহস্তের পরিবেশনে উদর পূর্ত্তি করে প্রসাদ গ্রহণ করে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, বেরিয়ে এলাম কলকাতা ফিরবার জন্যে। শ্রীশ্রীমা নিজেই আমাদের রওনা করিয়ে দিলেন বহিরাঙ্গণে এসে। মায়ের মুখ তখন সন্তান-কল্যাণ-কামনায় বিধুর—মাতৃত্বের স্নেহে উদ্ভাসিত—সন্তানদের বিদায়-ব্যথায় ম্লান। যতদূর দেখা যায়—দেখলাম শ্রীশ্রীমা হাত উঁচু করে যাত্রাপথ আশীর্ব্বাদে ভরে দিচ্ছেন। এমন নইলে, 'তুমি মা'! মাগো! তোমার পরিচয় তুমি নিজেই যে!

গাড়ী কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরই আমি ডাক্তার-দাদাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলাম শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে—এমন কি, তিনি ভাল করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছেন কিনা, সেই প্রশ্নও।

মাগো! তোমার শ্রীদেহের জন্যে যে সংশয় আমার মনে রেখেছ, যে ভাবনা-চিন্তা রেখেছ—চিরজীবন জন্মজন্মান্তরেও যেন অটুট থাকে—সেই আশীর্ব্বাদই দিও গো জননী!

নিজে অসুস্থ হওয়াতে ও সাংসারিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়াতে মায়ের কাছে সেবার আর যেতে পারিনি। তবে, আমার মায়ের আশীর্ব্বাদে সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুচারুভাবেই সুসম্পন্ন।

১০

মায়ের অনন্ত কথা—অসীমাকে সীমায় আনতে যাওয়া কি সম্ভব? মায়ের কৃপায় মনোজগতে অফুরন্ত অনুভূতি—যা আসে যায়—মনের মাঝেই লয় পায়। মন যত দুরন্ত বেগে ছুটে চলে, হাতের লেখনী গতিতে ততই মন্থর হয়ে ওঠে। মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে মনোজগতে মনোময়কে নিয়ে—দিকে দিকে শ্রীমায়ের প্রকাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে অনুভব করা যায়—মন উছল আনন্দ-জোয়ারে আপ্লুত হয়ে ওঠে!

সেই আনন্দ সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা জাগে—প্রকাশ ও বিকাশের

বিশেষ ভঙ্গিমায়—শ্রীশ্রীমায়ের অনবদ্য রূপের মহিমান্বিত ব্যঞ্জনা—মনের সুগভীরে যা রয়েছে প্রতিষ্ঠিত!

যা সাধ্যের বাইরে—সেই অধরাকে ধরবার সুকৌশল তিনি নিজেই। তাইতো, তাঁর ধরা-ছোঁওয়ার রূপটি তিনি নিজে প্রকাশিত না করলে—তাঁর আশীর্ব্বাদ না পেলে—অসাধ্য যা সাধ্যের বাইরেই থেকে যাবে। তাই মায়ের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি—তুমি প্রকাশিত হও, তোমার সন্তানদের কৃপা করে জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও—তোমার শক্তির দ্বারা পরিচালিত কর—তাদের মনোগত ইচ্ছা-প্রকাশে সাহায্য কর। মাগো! অহংভাবের সামান্য কিছু মনে যদি থাকে, তবে তোমার রচনার পরিপূর্ণতা আসবে কি করে! মাগো! আমার অহংটুকু তোমার মাঝে বিলীন করে তোমাময় করে নাও—যে ভাবে আমাকে চালাবে, বলাবে—সেই পথেই যেন যেতে পারি—সেই আশীর্ব্বাদ করো—তোমার অভয় পদে শরণ দিও।

১১

লীলাময়ী মা

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

মা ১লা আগষ্ট তারিখে বেনারস ফিরে গিয়েছেন। ওখানে যেয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই মায়ের শ্রীদেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—ব্রহ্মচারিণী শ্রদ্ধাদেবী আমার কাছে ও ডাক্তার-দাদার কাছে বেনারসের ডাক্তারের মতামত ও এক্সরে রিপোর্ট পাঠালেন।

আমি চিঠি পেয়েই ডাক্তার-দাদাকে ফোন করলাম। তিনি বললেন—

"এতদূর দূরে থেকে তো চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তুমি এক কাজ করো—টুক্ করে বেনারস গিয়ে মাকে কলকাতায় নিয়ে এসো তো বাপু—ওদের রিপোর্ট ঠিক নয়।"

আমি বললাম—তুমি কি বলছো? আমি গেলেই কি মা আসবেন?

ডাক্তার-দাদা বললেন—"আসবেন রে বাপু আসবেন। তুমি গেলে মা ঠিকই আসবেন—না হলে, চিঠি লিখলে আসবেন না।"

কি জানি, তিনি একথা এত জোর করে বলাতে আমিও মন ঠিক করলাম যাব বলে। সংসারে কত বাধা। ভাবছি, মায়ের সন্তানেরা যে কেউ গেলেই মা আসবেন—তবে, হয়তো এ কাজের ভারটা আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন।

এর মধ্যে শ্রীমান পিণ্টু ভাই ও শ্রীমতী অশোকাও শ্রীশ্রীমায়ের জন্যে প্রাণভরা উদ্বেগ নিয়ে আমার কাছে ছুটে এলো পরামর্শের জন্যে—শ্রীশ্রীমায়ের লীলা একমাত্র মাই বলতে পারেন। আমি বেনারস যাবার ইচ্ছা তাদের জানালাম—আমি জানি মায়ের ইচ্ছা না হলে কিছুই হবে না। তাই, তাঁর চরণে জানালাম কাতর প্রার্থনা—"যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছ, তার পালনের ব্যবস্থা যে তোমারই, মাগো!"

সত্যিই, মায়ের আশীর্ব্বাদে অতি সহজেই সুবন্দোবস্ত হয়ে গেলো। আমার দু'জন আত্মীয় আমাদের বাড়ী থেকে বম্বে রওনা হচ্ছিলেন ৬ই সেপ্টেম্বার। তাঁদের বিদায় দিতে ষ্টেশনে যাবার সময় একটি ছোট ব্যাগে আমার প্রয়োজনীয় ২।৪টি জিনিস গুছিয়ে নিলাম, রওনা হবার পূর্ব্বে। ওরা জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও যাবেন নাকি? উত্তরে জানালাম—'দেখিতো কোথায় যাই—আগে তোমাদের রওনা করে দিয়ে নিই।' শ্রীশ্রীমায়ের বাবুজী আমার মনের ইচ্ছা জানতেন। বল্লেন—"তুমি বেনারস যাবে, টিকিট পাবে?" আমি বললাম—"কি আর আছে, ষ্টেশনে তো যাচ্ছিই—টিকিট না পেলে ফিরে আসবো।"

রাত ৮-৪৫ মিনিটে ষ্টেশনে পৌছেই এনকোয়েরীতে যেয়ে জানলাম—অনেক বার্থ আছে—দুন এক্সপ্রেস খালি যাচ্ছে। 'মাগো মা', আমরা কত জল্পনাই না করি, সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তুমি যে প্রতিবারই সুব্যবস্থা করে রাখছো—তবুও আমাদের খেয়াল হল কই?

বেনারস পৌছে দুরু দুরু বক্ষে হৃদয়ের আবেগ নিয়ে সন্ত-আশ্রমে এসে

পৌঁছালাম। দরজা খুলে ঢুকতেই আমার স্নেহের বোনেরা বলে উঠলেন—"ওমা! রেণুকাদি এসেছেন।" কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্রীশ্রীমাকে দেখলাম—উপর থেকে নীচের সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছেন—মুখে মৃদু হাসি। এত তাড়াতাড়ি, আমি আশ্রমে ঢুকতে না ঢুকতেই, মা কি করে খবর পেয়ে নীচে এলেন—মনে ভাবছি—অমনি বিদ্যুৎস্পর্শের মত মনে জেগে উঠলো—"মা যে অন্তর্যামী—তুই যে আজ আসবি সবই তাঁর নখদর্পণে। তাঁর কাছে অজানিত কি আছে?"

মা জিজ্ঞাসা করলেন—"কিগো, কি খবর?"

প্রতিবারই মায়ের কাছে বেনারস গেলে মনে ইচ্ছা জাগে—পৌঁছেই শিশুর মতন মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো, আর দু'হাতে জোরে মাকে জড়িয়ে ধরে মা, মা করে ডাকবো। এবারও সারা ট্রেনে সেই চিন্তাই ছিল। কিন্তু, বাইরের বাধা অনেক; মনটা ছোট্ট রয়েছে—কিন্তু দেহে যে বেড়ে গেছি অনেক। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে প্রণাম করে, ডাক্তার-দাদার কথা নিবেদন কোরলাম।

মা তখন সন্তানের বিশ্রামের জন্যে ব্যস্ত। বল্লেন—"তুমি ক্লান্ত; স্নান করে প্রসাদ পেয়ে নাও, সব কথা হবে।"

স্নান সেরে শুনি শ্রীশ্রীমা মাতৃধামে বসে আছেন। তখন মায়ের বিশ্রামের সময়। আমি দ্রুত পায়ে মাতৃধামে ঢুকে মায়ের চরণে মাথা রাখতেই মা আমার মুখটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিলেন—আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেলো—মুখে এসে গেলো—মা-মা-মা-নাম।

প্রণাম-শেষে মা বললেন—"এখন কোন কথা নয়, আগে নীচে যেয়ে প্রসাদ পেয়ে এসো—তারপর কথা হবে।"

নীচে যেয়ে দেখি সুমণি ও দিদি ভাই অপেক্ষা করছেন—তাদের কাছে মায়ের শ্রীদেহের কথা সব শুনলাম। সবাই মায়ের জন্যে চিন্তিত। মনটা বিষাদে ভরে উঠছিলো। কিন্তু মায়ের তো হাসি-খুশীর অভাব নেই—মনে হয়, কি জানি এক অনন্ত খেলায় মেতে রয়েছেন।

মায়ের কাছে যেতেই—সেই সুললিত হাসির লহরী দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি গো, তুমি কি আমাকে কোলকাতা নিতে এসেছ ডাক্তার-ছেলের নির্দ্দেশে—সে কি বলে?" আমি বোললাম—"কি যে বল মা, আমি কি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি? আমি আজ্ঞাবাহী মাত্র—তাই, এসেছি তোমার পাশে মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতায়। মাগো, তুমি কয়েকদিন কোলকাতা না থাকলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা মুস্কিল। কল্যাণীতে থাকলে চলবে না—আর বেনারসের এক্সরে ডাক্তার-দাদা বিশ্বাস করতে পারছেন না। বলেছেন—তোমাকে কয়েকদিন সময় দিতে। তুমি এখন কি করবে বল?"

মা আবার সেই দুষ্টুমি-হাসি হেসে বললেন—"যখন নিতেই এসেছ, তখন সাথে চলেই যাই, কি বল?"

মাগো! কত অযাচিত করুণা-কৃপা তোমার! সন্তান যখন এসেছেই, তাকে রিক্ত-হস্তে ফিরাবে কি করে!

মনে মনে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম জানালাম। সাথে সাথে ভূমিষ্ঠ হয়েও। সেইবারই কিন্তু মা আমাকে আরো কৃপা করেছিলেন—তাঁর অনিন্দিত রাতুল চরণ-যুগলে হাত বুলিয়ে দেবার অধিকার-দানে—যে চরণযুগল বন্দিত হচ্ছে যুগে-যুগে দেবীরূপে, প্রাণের আরাধনায়!

শ্রীশ্রীমায়ের কর্ম্মদক্ষতা কারো অজানা নেই; সেই মুহূর্ত্তেই, কোন দ্বিধা না করে, তার একদিন পরেই রওনা হবার সব বন্দোবস্ত করে ফেল্‌লেন।

চিকিৎসার ব্যাপারে, দরকার হলে একটা অপারেশন হতে পারে। তাই, আশ্রমের ভাই-বোনেদের সবারই খুব মন খারাপ—চোখে জল। পরম-স্নেহময়ী দিদিমা 'ও খুব বিচলিত ও ব্যাকুল। সবাই বলছে—"আশ্রম খালি করে মাকে নিয়ে যাচ্ছ—ভালভাবে ফিরিয়ে দিও।" মাকে যে এরা অন্তরের সাথে কত ভালবাসে—মা-মণি যে এদের প্রাণকেন্দ্র—তাঁরই অমঙ্গল আশঙ্কায় সবাই শঙ্কিত ভীত। আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগছিলো—নিজেকে

অপরাধী বোধ হচ্ছিল! ওদের সাথে সাথে আমার ও চোখে জল এসে যাচ্ছিল —'শুধু মা-মণি ভরসা!

আমার স্নেহময়ী 'মা' আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন—তাই, সান্ত্বনারূপে কি গভীর পুরস্কারে পুরস্কৃত করলেন, সেই কথায় আসছি।

মায়ের গোপাল। অপরাহ্নে পাঠের পর শ্রীমা ব্রজধামের নাটমন্দিরের দরজায় আসন পেতে বসেছিলেন, জোড়াসন করে। সেখানে আমরা সবাই ছিলাম। মা তাঁর সন্তানদের কাছে চিঠি লেখাচ্ছিলেন—হঠাৎ দেখি শ্রীশ্রীমা ভাবে একটু আত্মস্থ হয়ে গেলেন। একটু পরেই মায়ের কোলের কাছের শাড়ী দেখলেন—আমরাও দেখলাম—কোলের মধ্যে ছোট্ট ছেলে শুয়ে উঠে গেলে যে রকম চিহ্ন পড়ে তেমনি পড়েছে। মাথার ছাপ ও শিখিপাখার ছাপ রয়েছে, স্পষ্টভাবে, ঈষৎ নীলচে রঙএর।

এ সম্বন্ধে আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। এ ছাপ কোথা থেকে এলো —ছোট্ট ছেলের প্রতিকৃতির স্পষ্ট ছাপ। সুমণিকে জিজ্ঞাসা করতে জানলাম —শ্রীশ্রীমায়ের কোলে এসে শ্রীগোপাল শুয়েছিলেন, তাই তাঁর চিহ্ন রেখে দিয়ে গেছেন। মায়ের কিষণলালজী বড়ই দুষ্টু ও চঞ্চল—যখন তখন এসে মায়ের উপর স্নেহের দাবী জানিয়ে যান শুনেছিলাম। আজ কৃপা করে মা নিজেই জানিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন।

মনে হোল, গোপালজী মায়ের কাছে তাঁর অনন্ত দাবী জানিয়ে গেলেন— তুমি তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাবে না, যেতে পারবে না—তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

মাগো! কৃপা করে ধন্য করেছ—তোমার সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে করেছ পুরস্কৃত—জানা-অজানার সন্ধিক্ষণে দিয়েছ মহৎ প্রেরণা—মচিন্‌কে চিনবার সুযোগ। ধন্য আমি, পূর্ণ আমি, তোমার সন্তান হয়ে—তোমার চরণে রাখলাম আমার অযুত কোটি প্রণাম।

১২

অন্তর্যামী-শ্রীশ্রীশোভা-মা

সন্ধ্যা-আরতির পরে আমরা মাতৃধামে এসে মায়ের চারপাশে বোসলাম। শ্রীশ্রীমা কোলকাতায় গিয়ে কোথায় থাকবেন সেই কথাই হচ্ছিল। পিন্টু ভাইরা লেক গার্ডেনসে সুরেশদার বাড়ীতে মাকে ওঠাবার কথা ভেবে রেখেছিল। গোপেনদা ও গোপাদি তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন—তাদের বালীগঞ্জে পণ্ডিতিয়ার বাড়ীটি খালি থাকাতে শ্রীশ্রীমাকে অনুরোধ জানালো, কৃপা করে সেখানে থাকবার জন্যে। ছোট বাচ্চার মতন শ্রীশ্রীমাও রাজী হয়ে গেলেন সানন্দে। সব খবর জানিয়ে, তখুনি প্রসাদ-ভাইকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হোল। মায়ের একান্ত ভক্ত গোপেন-দাও টেলিগ্রাম করে ষ্টেশনে গাড়ীর বন্দোবস্ত ও বাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিলেন—যাকে দিয়ে যেটুকু করাবার, শ্রীমা কৃপা করে সেটুকু করিয়ে নেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করলেন না।

মায়ের স্নেহ-সান্নিধ্যে কাটিয়ে সারাদিন মন আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল। মা-মা চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই মনে ছিলো না। রাত্রে আমার আশ্রমিকা-বোনেদের সযত্নে রচিত শয্যার পরে যখন দেহ ভারটুকু ছেড়ে দিলাম তখন মানস-চক্ষে ভেসে উঠলো শ্রীযুক্তা দিদিমা ও বোনেদের বিষণ্ণ ক্লিষ্ট মুখ। মায়ের চিন্তা-ভাবনায় মনটা বড়ই বিচলিত বোধ করতে লাগলাম—শ্রীশ্রীমায়ের চরণেই মঙ্গল প্রার্থনা জানাতে লাগলাম, নামের মাধ্যমে। হঠাৎ, সবকিছু ছাপিয়ে আমার মাঝে একটা বাসনা, একটা আকাঙ্খা আলোড়িত হয়ে উঠলো।

কিছুদিন একটা শুভকাজে আমার স্বর্গগতা কাকীমার শাড়ী পরে শুভ কাজ কোরছিলাম; তখন আমার মনে হয়েছিল আমার স্নেহময়ী মায়ের একটা প্রসাদী শাড়ী পেলে বেশ হয়—যা তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদের মতই জড়িয়ে থাকবে, শুভ কাজে, তাঁর প্রফুল্ল হাসির কল্যাণময়ী রূপটি নিয়ে! মনের অজান্তে কখন আবার সেই বাসনা মনের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছিল।

মনের গভীর সাধ প্রসাদী শাড়ীর—সে সময় আমার মাঝে এসে দোলা দিতে লাগলো। ভাবছি, মায়ের কাছে তাঁর প্রসাদী শাড়ী একটা চেয়ে নেবো —মায়ের কাছেই তো চাইবো—তাতে আর লজ্জা কি? মায়ের জ্ঞাতার্থে, জ্ঞাপনের বাসনায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনের মধ্যে তোলপাড় করছে—চাইবো কি চাইবো না—কেড়ে নিয়েছে চোখের ঘুম। মনের অস্থিরতার সাথে জড়িয়ে এলো স্থির-প্রতিজ্ঞা—পার্থিব জিনিষ কিছু মুখ ফুটে মায়ের কাছে চাইবো না—শুধু মনের কামনা-বাসনা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সমর্পণ কোরলাম। মায়ের আশীর্ব্বাদে মন শান্ত হোল, ঘুমিয়ে পড়লাম। বাসনা ভাষায় প্রকাশের অনিচ্ছা আমার মনে জাগিয়ে, শ্রীশ্রীমা আমার মন প্রশান্তিতে ভরে দিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে আশ্রমের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে নিজেকে সঁপে দিলাম। মাতৃমন্দিরে মাতৃধামে বসে আমার মায়ের স্নেহসান্নিধ্য প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগলাম—আর পেলাম অনুমতি শ্রীশ্রীমায়ের দুর্লভ রাতুল চরণ-যুগলে হাত বুলাবার—মায়ের পদরজ মাথায় তুলে নিলাম। দুর্লভ সাধনার ধন মায়ের পদযুগল ছাড়া আর কোন চিন্তা মনে ছিল না। মায়ের পরম প্রসাদে অপার্থিব প্রসাদ পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, মায়ের প্রসাদী শাড়ীর বাসনার কথা—যার জন্যে গতরাত্রে আমি এমনি আকুল হয়েছিলাম—তা যেন একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। সর্ব্ব কামনা-বাসনা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সমর্পণ করে, যেন সর্ব্ব কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি!

বেলা ১২টার সময় যখন প্রসাদে পরিতৃপ্ত হয়ে উপরে এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম কোরলাম তখন সেখানে নূতনদি (মায়ের পরম ভক্ত—ঈশ্বর-প্রদত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। প্রণাম করে উঠতেই —অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কল্যাণময়ী মা আমায় বল্লেন—"যাও তো রেণুকা, তোমার সুটকেশ খুলে দেখো তো, সব ঠিক আছে কিনা?"

আমি তো বোকা—অজ্ঞ, মূর্খ! তাই, মাকে বোল্লাম—সব ঠিক আছে তো মা। নূতন দি বল্লেন—"যাও না, দেখেই এসো—মা যখন বলছেন।"

মায়ের স্নেহের সান্নিধ্য ছেড়ে মোটেই উঠতে ইচ্ছা কোরছিল না। তবুও, মায়ের আদেশ মেনে নিয়ে, মিতালিতে এসে, স্যুটকেশ খুলেই—আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না—স্যুটকেশের উপরেই রয়েছে সুন্দর একখানা লাল পাড় শাড়ী—জরির কাজ করা। পরিপাটীভাবে ভাঁজ করা। এযে শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী শাড়ী—যে শাড়ী মায়ের অঙ্গস্পর্শ করে ধন্য হয়েছিল পঞ্চাশত্তম জন্ম-উৎসবের সময়। মনে মনে ভাবলাম, কি করে জানলেন তিনি? আমি তো মায়ের কাছে কেন, কারোর কাছেই তো আমার ইচ্ছার কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিনি—শুধু, মনে মনে মায়ের চরণে বাসনা সমর্পণ করা ছাড়া। এক মূহূর্তে নিজের অজ্ঞতায় শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্য্যামী মহীয়সী রূপটি ভুলেই বসে ছিলাম। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আত্মবিস্মৃত হোলাম—চোখ জলে ভরে উঠলো।

অধীর আগ্রহে ছুটে এলাম আমার ইচ্ছাময়ী জননীর কাছে—"মাগো মা—তুমি কি করে জানলে, কি করে বুঝলে আমার বাসনার কথা—বল না, মাগো।" তখন আমি এমনি অভিভূত হয়ে গিয়েছি—বেশী কথা বলার সামর্থ্য নেই। সন্তান-বৎসলা স্নেহময়ী জননী—মৃদু মৃদু হাসছিলেন—অপার স্নেহ-করুণায় নয়ন ছিলো উদ্ভাসিত। ছোট্ট করে বল্লেন—"আমি মা তো—তুমি মেয়ে—তাই বুঝেছি—।"

মায়ের মুখের পানে চেয়ে দেখি শুভদা বরদা শোভামা—প্রতিটি অন্তরের কামনা-বাসনার মাঝে বিন্দুবাসিনী রূপটি নিয়ে বসে আছেন অন্তর্জগতে!

মাগো মা! তুমি তো শুধু অন্তর্যামীই নও, তুমি তো মা অমৃতময়ী—তোমার স্নেহবিগলিত করুণার ধারা অমৃতের মতন ঝরে পড়ছে সকল সন্তানের উপর! প্রতিটি সন্তানের কামনা-বাসনার মাঝে মঙ্গলময়ী, অন্তর্যামী-রূপে সংস্থিতা। তুমি কতভাবেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছ—তবু ও অন্ধ আমরা—বারে বারে অন্ধ-নয়নে দৃষ্টিশক্তি দান করলেও সংশয়ের, সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাদের নয়ন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই আচ্ছন্নতা কাটিয়ে অমৃতের

সন্ধানে আমাদের সহায়তা করো—তোমার কৃপাদৃষ্টি দিয়ে মোদের ক'রে তোল সজাগ।

মায়ের তখন বিশ্রামের সময় হয়ে গেছে—তাঁকে প্রণাম জানিয়ে উঠে এলাম। নূতনদি বল্লেন—শাড়ীটা পরে মা-মণিকে প্রণাম কোরো। আমি নীরবে সম্মতি জানিয়ে—মনে আবেগের তন্ময়তা নিয়ে মিতালিতে ফিরে এলাম।

১৩

পরদিন প্রত্যুষে স্নান করে, মনে মনে শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ ও ধ্যান করে, মায়ের দেওয়া প্রসাদী শাড়ী মাথায় ছুঁইয়ে, ভক্তিভরে পরিধান করে—মাতৃমন্দিরে যেয়ে অন্তর লুটিয়ে মাকে প্রণাম জানালাম।

তার আগে রাত্রিতে কিন্তু একটা অবিশ্বাস্য মজার ঘটনা ঘটেছিল—আমার বিশাল বপু নিয়ে রাত্রিবেলা খাট থেকে পড়ে গেলাম মেঝের উপরে। ঘুমের মধ্যে, পড়ে যাচ্ছি, সে বোধ হল—কিন্তু, মনে হোল, কেউ যেন অতি সন্তর্পণে দু'হাতে আমাকে ধরে নরম গদির উপর শুইয়ে দিল। আমি যখন ঘুম ভেঙে তাকালাম—দেখি মেঝের উপর শুয়ে আছি—দেহের কোথাও ব্যথার চিহ্ন দেখলাম না বা ব্যথা-বোধ করলাম না! তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে এলাম। আমি খাটের যে পাশে পড়েছিলাম তার অন্যদিকে আমার কয়েকজন বোন মেঝেতে বিছানা করে শুয়েছিলেন। বিছানায় শুয়ে ভাবলাম—ভাগ্যিস! আমি অন্য ধারে পড়েছিলাম ; নাহলে, বোনেরা আমার চিড়া-চ্যাপ্টা হয়ে যেতো! 'জয় মা'! আশ্চর্য! ওরা আমার পড়ে যাবার শব্দ শোনেনি, সব অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তারপর মনে মনে ভাবলাম, এটা কি করে সম্ভব হোল, আমি একটুও ব্যথা পেলাম না! মনের মাঝে ঝিলিক্ দিয়ে উঠলো—তুমি যে পরম আশ্রয়দাত্রীর আশ্রয়ে এসে রয়েছ, তোমার চিন্তা কি? মন গভীরে ডুবে যেয়ে বোধ হতে লাগলো শ্রীশ্রীমা যেন আশেপাশেই রয়েছেন।

প্রভাতে নাম-গান ও পাঠ শেষ হলে, রোজ মা মন্দির-প্রদক্ষিণ করেন ও শ্রীতুলসী-চরণে প্রণতি জানান। এই সময় মায়ের আত্মবিভোর বিশেষ রূপটি পরিলক্ষিত হয়—মা তাঁর বিভোর ভাবটি সন্তানদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়ে যান।

তারপর শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে সবাইকে প্রভাতী প্রসাদ বিতরণ করেন—সেটি নয়ন ও মনে উপভোগ করার মতন। মা উঁচু পিঁড়ে পেতে বসেন। তারপর একটির পর একটি প্রসাদের রেকাবী সাজিয়ে যান—কোনটায় কম, কোনটায় বেশী—সন্তানদের চাহিদা বুঝে। আমি দেখলাম না কোনদিন, গুণতিতে একটি রেকাবীও কম বা বেশী হোল—মায়ের আন্দাজ নিখুঁত। সন্তানেরা উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মায়ের শ্রীহস্তের প্রসাদ পাবার জন্যে—প্রতিজনের হাতে এসে পড়ে ঠিক তার পরিমিত প্রসাদ। কোথাও ভুল নেই, ভ্রান্তি নেই, ত্রুটি নেই!

এই তো অন্নপূর্ণা মায়ের রূপ! তবে, আর শ্রীঅন্নপূর্ণা-মন্দিরে যেয়ে কি হবে? এসো সবাই আমরা নয়ন-ভরে এই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করি।

১৪

(সেদিন ছিল ৯ই সেপ্টেম্বর) মায়ের প্রসাদী শাড়ী পরে নাম-গান ও পাঠের পরে বসেছিলাম, ব্রজধামের নাট-মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু, মনে হোল—শালগ্রামদেবজী বড় নারকোলের মতন আকার ধারণ করে রয়েছেন। আমি ভাবলাম—শালগ্রামদেবজীকে তো শ্রীশ্রীমা-ই প্রতিষ্ঠা করেছেন; তবে, মা কেন শালগ্রামদেবজীর মাথার উপর সোনার ছত্রীটা এত ছোট করে তৈরী করেছেন? বড্ড বেমানান লাগছে—আমার ঘুরে ফিরেই ঐ কথা মনে হতে লাগলো। তাই, ছোট্ট মিঠুকে আমার মনের কথা বলেই ফেললাম—মায়ের কাছে বলতে পারিনি ঐ সোনার ছাতিটি বেমানান ছিল বলে (তখন আমার তাই মনে হয়েছিল)!

মিঠু বললে—"না, রেণুকাদি! শালগ্রামদেবজী তো অত বড় নন।" এসময়

সন্ধ্যা ঘরে আসতে, কি হয়েছে শুনে, বললে—"শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় শালগ্রামজীকে অনেকেই অনেকভাবে দেখেন।" আমি ছুটে নীচে গেলাম, দেখি তখন নাট-মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে।

অপরাহ্ণে আমরা কলকাতা রওনা হবার জন্যে তৈরী হয়ে ব্রজধামে এলাম—মা-মণি আগেই এসে গেছেন। ব্রজধামে এসে শালগ্রামজীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম—না তো, তিনি তো বেশ ছোটখাটটিই বসে রয়েছেন। মস্তকোপরি সোনার ছাতাটি তো বেমানান নয়। একি হোল—মাগো? এ তুমি তোমার যাত্রার দিনে কি কৃপা করলে তোমার এই অধম মেয়েটিকে? এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি আছে, তুমিই জানো।

বন্যার জন্যে প্রতি গাড়ী লেটে চলছিলো। মা-মণির সাথে আমরা যাবো পাঞ্জাব মেইলে—গাড়ী ৩।৪ ঘণ্টা লেট। ডাক্তার মিসেস দুবে মায়ের যাবার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছেন—ব্রজধামে বসে মায়ের সাথে কথাবার্তা বলছেন। অতবড় ডাক্তার, কিন্তু, মায়ের প্রতি তার অবিচল ভক্তি-নিষ্ঠা।

ষ্টেশনে রওনা হবার আগে আমার স্নেহময়ী দিদিমা আমাকে বললেন—"রেণুকা, মাকে যেমনটি নিয়ে যাচ্ছো, তেমনটি কিন্তু আশ্রমে ফিরিয়ে আনবে।" দিদিমার এই কাতর কথায় অন্তরের সব ব্যাকুলতা ঝরে পড়লো। দিদিমা যে কত স্নেহময়ী তার পরিচয় তাঁর কথায়, কাজে ও ব্যবহারে। এমনি বলেই তিনি রত্ন-প্রসবা। পরিবারের প্রতিটি জন অন্তর-মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

আমি রাধাবিহারীজীর দিকে আবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইলাম—মনে স্থিরভাবে একটা প্রতিজ্ঞা ও কথা উঠে এল—"শ্রীশ্রীমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যেমনটি মা যাচ্ছেন তেমনটি যদি ফিরিয়ে না আনো, তবে আর কোনদিনও তোমার মুখদর্শন করবো না—মায়ের যেন অপারেশনের দরকার না হয়।"

কোথা থেকে এত জোর এলো, কেনই বা বোল্লাম, কে বলালেন—তাও আমি জানি না। শুধু জানি—মা আছেন, সব দায়িত্বই যে তাঁর—আমার কি? 'জয় মা' বলে মায়ের সাথে সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মা এবার জেদ ধরেছেন থার্ড স্লিপারে সবার সাথে যাবেন। আমাদের মেয়েটি ছোট হলে কি হবে—ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়। অগত্যা ঐ ব্যবস্থায় সবাইকে রাজী হতে হয়েছিল। মায়ের আশীর্ব্বাদে কিন্তু থার্ড স্লিপার স্পেশ্যাল ক্লাশে পরিণত হয়েছিল। আমরা সাইডিং-এ বেনারস-বগীতে যেয়ে উঠে দেখলাম—পুরো কামরাটার মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের সাথীরা ছাড়া আর ২।১টি মাত্র যাত্রী। মহা আনন্দে আমরা ইচ্ছামতন জায়গা করে নিলাম। লেডীজ কামরাটা ভালভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে, মায়ের ঠাকুর-ঘরে পরিবর্ত্তিত হোল।

আশ্রম থেকে আনীত ডালপুরী, আলুর দম, মিষ্টি, মায়ের শ্রীহস্তে পরিবেশিত হয়ে, আমাদের কাছে এলো—আমরাও মায়ের জয় দিয়ে প্রসাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিলাম। আমাদের এক ডাক্তার ভাই বক্সার পর্যন্ত একই গাড়ীতে গেলেন। যতক্ষণ তিনি ছিলেন, শ্রীশ্রীমা শুয়ে পড়বার পর, অতি নিষ্ঠার সাথে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। আমি মায়ের মাথার কাছের বার্থে বসেছিলাম—আর রাতের প্রকৃতি-শোভার সাথে শ্রীমায়ের ঘুমন্ত শ্রীমুখের প্রতিচ্ছবি মিলিয়ে নিচ্ছিলাম।

মনে হচ্ছিল, ঘুমের সাথে, ঘুমের রাজ্যে, আমাদের 'মা-মণি' মিতালি পাতিয়েছেন—প্রকৃতির সাথে সুপ্তির আবেশে আবেশিত হয়ে।

বক্সার এলেই মা কিন্তু জেগে উঠে তাঁর ছেলেটিকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন—মিলনের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

ভোরের আবছা আলো ফুটে উঠতে লাগলো। রাত্রি ও প্রত্যুষের সন্ধিক্ষণের প্রাকৃতিক মহারূপ হৃদয়কে করে আচ্ছন্ন। মনে হয়, যেন মহাযোগী তাঁর ধ্যানগম্ভীর স্তিমিত নয়নে চেয়ে রয়েছেন। আর প্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁকে জানাচ্ছে তাদের প্রণতি। শুদ্ধ অন্তরে মন তখন সমাহিত হয়ে যায় প্রকৃতির রূপের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে। ট্রেনের গতির পথে এই রূপ বড় মনোহর। তাঁর রূপটিই যেন ছড়িয়ে থাকে বনে-জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর চোখে মুখেও লেগে রয়েছে প্রকৃতির আমেজের ছোঁয়াচ। বিরাট বিশ্বরূপের বিশেষ একটি রূপ নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুম থেকে জাগলেন—মনে হোল, প্রকৃতিও যেন জেগে উঠলো সেই সাথে।

আমি তখন আবার স্বস্থানে এসে শুয়ে পড়েছি—চোখ খোলাই ছিলো—মনে মনে নিজেকে নিবেদন কোরলাম মায়ের চরণে।

মা বল্লেন—"রেণুকা, তুমি তাড়াতাড়ি উঠোনা, শুয়ে থাকো।"

আমি জানি, তার ২ দিন আগেই আমি বেনারস গিয়েছিলাম—তাই, মা আমার পথের ক্লান্তির কথা ভেবে মাতৃস্নেহে বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করছেন।

কিন্তু, তুমি তো জাননা, মা-মণি—

তুমি যদি থাকো সাথে, নাহি ক্লান্তি নাহি ভয়—।
দীর্ঘ পথ দিতে পাড়ি
তুমি যে মা কাণ্ডারী
চিত্তের বৃত্ত মাঝে তুমি মা অভয়।

আশ্রমিকা বোনেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে, ট্রেণের সেই ঠাকুর-ঘরে ধূপধূনা জ্বালিয়ে আরতি করে, ভোগ-নিবেদন করলেন। তার পর নাম-গানে মাতোয়ারা হয়ে, চারদিকে ঠাকুরজী ও মায়ের নাম ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। বড় সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি হোল—মধুময়, মনে হোল সকলই মধু—বিশ্বময় সকলই মধু!

আমি সংসারে যে আবহাওয়ার মাঝে আছি, ঠিক এইভাবে অভ্যস্ত নয় বলে, আমার কিযে ভাল লাগছিলো—বলে বোঝাতে পারবোনা—যদি কেউ বোঝে, মা'ই বুঝতে পারবেন।

বেশ লেট করে, প্রায় বেলা ১২টা নাগাদ ট্রেণ এসে দাঁড়ালো হাওড়া ষ্টেশনে। প্রসাদ, গৌর রামকৃষ্ণদা, অশোকা, পিণ্টু—আরো অনেকে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। মা আমাকে তাঁর সাথে পণ্ডিতিয়ার বাড়ীতে যেতে

বললেন—তারপর বাড়ীতে যাবার কথা বল্‌লেন। শ্রীমায়ের আদেশের অপেক্ষা কোরছিলাম—সুতরাং, তখনই ছেড়ে যেতে হবে না বলে, মন আনন্দে ভরে উঠ্‌লো। মা তো সব সময়েরই সাথী, তবুও চিন্ময়ী মাকে ছাড়তে মন চায় না। পণ্ডিতিয়া এসেও মা আদেশ করলেন এখানে প্রসাদ পেয়ে তবে যাবে।

আমার বাড়ীর সবার বাইরে চলে যাবার কথা ছিলো আগেই—তবুও মায়ের ইচ্ছায় ও আদেশে ফোন কোরলাম ও জানতে পারলাম—বাড়ীর সবাই পরের দিন খুব ভোরে বের হবে। মাকে এই কথা নিবেদন কোরলাম।

পণ্ডিতিয়ার বাড়ী বন্ধ ছিলো ; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে শুচিতার রূপ ধারণ করলো। মায়ের আগমনীতে—মায়ের পবিত্র পদধূলিতে, গৃহ ধন্য হয়ে মাতৃমন্দিরে পরিণত হোল।

ডাক্তার-দাদাকে ফোন করা হোল। তিনি বিকাল ৪টার সময় এসে তার পরদিনই সকালে ৮টায় পার্ক নার্সিং-হোমে মায়ের এক্সরে নেবার বন্দোবস্ত করলেন এবং মায়ের নার্সিং হোমে যাবার জন্যে তিনি গাড়ী পাঠাবেন জানালেন।

সন্ধ্যায় মায়ের আদেশে নিউ আলিপুরের বাড়ীতে ফিরে এলাম। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বলে এলাম—"ওরা সবাই রওনা হলেই, আমি সোজা নার্সিংহোমে চলে আসবো, মাগো।"

মা ব্যস্ত হচ্ছিলেন—"তোমার গাড়ী চলে যাবে, তুমি একলা কি করে আসবে?" মায়ের মনের সেই চিরন্তন ব্যাকুলতা। 'মা যেখানে রথের রথী—সেখানে তোর ভয় কিরে আর?' বোল্লাম—তুমি নিয়ে আসবে।

বাড়ীতে এসে পড়ে গেলাম—মহামুস্কিলে। সবাই ধরে বসলো—"তুমিও আমাদের সাথে চলো।" এতক্ষণ তো আনন্দেই ছিলাম—মা যেন তখন আমাকে ক্লান্ত করে দিলেন!

আমি বোললাম—আমি খুব ক্লান্ত—তোমরা যাও ; সব তো আমার দেখা

জায়গা ; তাছাড়া, কালই শ্রীশ্রীশোভা-মায়ের এক্সরে হবে—সেদিনটা আমি এখানে থাকতে চাই। বাড়ীর কর্ত্তা আমার কথা মেনে নিলেন। এর পরেই আমি দ্বিগুণ উৎসাহে ওদের জিনিষপত্র গুছিয়ে দিলাম—যাতে খুব ভোরেই রওনা হয়ে যেতে পারে—তাহ'লে, আমি যে তাড়াতাড়ি 'মা-মণির' কাছে যেতে পারবো। ভোরেই ওরা রওনা হয়ে গেলো আর সাথে নিয়ে গেলো আমার পরম আদরের মা-মণির আশীর্ব্বাদ।

১৫

'রহস্যময়ী মা'

সকাল থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে অনবরত প্রার্থনা জানাচ্ছি—"মাগো, তোমার এ মেয়েটার মুখ রেখো মা—অপারেশনের মত তোমার যেন কিছু না পাওয়া যায়।"

তৈরী হয়ে সোজা চলে গেলাম নার্সিং হোমে। ডাক্তার-দাদার সাথে দেখা হলেই জানালেন—শ্রীমা এসে গেছেন—তুমি যাও উপরে। বলে, ঘরের ডিরেকশন্ দিয়ে দিলেন। মা যেখানে থাকেন সেখানে যে মা-মা সুগন্ধ বের হয়—সেজন্যে গন্ধ ধরে মায়ের পথ চিনে নিতে দেরী হয় না! অনেকেই তখন উপস্থিত—এক্সরে আরম্ভ হয়নি।

নার্সিং হোমের মেট্রন ও সিষ্টারেরা মায়ের আরামের জন্যে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়ে রইলেন এবং তাদের শ্রদ্ধা জানালেন নানা ভাবে। শ্রীশ্রীমায়ের অতি অপূর্ব্ব স্নেহপূর্ণ মুখখানি যিনিই দর্শন করবেন, মন তাদের আকুল হয়ে উঠবেই উঠবে।

আমি মায়ের কাছটিতে বসে আমার মনের আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। একটু পরে ডাক্তার-দাদা এলেন শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। ডাক্তার-দাদা সহ আমরা মাকে প্রণাম কোরলাম। এক্সরে ঘর নীচে একতলায়—শ্রীশ্রীমায়ের সাথে আমরাও নীচে নামতে লাগলাম। আমরা

যখন নামছি—মায়ের শ্রীদেহের অপূর্ব্ব চাঁপা ফুলের সুগন্ধ এসে নাকে লাগতে লাগলো। মনে হচ্ছে—যেখান দিয়ে তিনি যাচ্ছেন—সেখানেই সেই সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে।

কই, মায়ের কাছটিতে যে এতক্ষণ বসে ছিলাম, এ রকম সুমধুর গন্ধ পাইনি তো? আমার পাশে যিনি ছিলেন, তাকে বলতেই, তিনি আমার দিকে একটু চাইলেন। মনে মনে হয়তো আমাকে পাগলই ভাবলেন—আমার মন কিন্তু তখন অদ্ভুত আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেলো। মনে হোল, তিনি যেন নিজের দেহ-সৌরভ দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেলেন—"ওরে, ভয় নাই—তোরা চিন্তা করিস না—তোদের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

মনে গভীর আস্থা এলো—মায়ের এক্সরেতে অপারেশনের মতন কিছুই আসবে না—সুগন্ধ দিয়েই তিনি তাই জানিয়ে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব্ব রহস্যময় খেলা—তাঁর সন্তানদের সাথে; তাঁর এই বিশ্বব্যাপী খেলায় আমরা পুতুলমাত্র।

সত্যিই, তাই হোল। কিছুক্ষণ বাদেই এক্সরে রিপোর্ট জানা গেল—ভয়ের কিছু নেই। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণত হলাম গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে।

সাথে দু'টো পোষ্টকার্ড নিয়ে গিয়েছিলাম—নার্সিংহোম থেকে দিদিমা ও বোনেদেরও এ সংবাদ জানিয়ে দিলাম।

মহা আনন্দে হৈ চৈ করতে করতে মাকে নিয়ে আমরা ফিরে এলাম পণ্ডিতিয়ার বাড়ীতে। এসেই বেনারসে ট্রাঙ্ককল করা হল।

শ্রীমাকে বললাম—"মিষ্টি খাওয়াও, মা!"

মা সহাস্যে উত্তর দিলেন—"আমি কেন তোমাকে মিষ্টি খা ব? তোমাকে মিষ্টি খাওয়াবেন তোমার দিদিমা। তুমি বেনারস চল, তোমার দিদিমা তোমাকে সর তুলে সর-ভাজা খাওয়াবেন।"

মাগো! তোমার কথায় যে মধু ঝরে পড়লো সেই মধুর মিষ্টিই আমার হৃদয় আস্বাদন করলো—জীবনে এর থেকে বেশী মিষ্টির আর কি দরকার আছে?

এবার মাকে, আমার আসবার আগে ঠাকুরজীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি সেই কথা জানাতে, মা বললেন—"তুমি এত বড় প্রতিজ্ঞা কেন করেছিলে? আর কোর না।" আমি একথার উত্তর দিতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীমাই যেন এবার তাঁর পুরোপুরি সঙ্গ দেবার জন্যে সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। বাড়ীতে কেউ না থাকাতে—মায়ের কাছে যাবার ও থাকবার ছিল অবাধ স্বাধীনতা। রাত্রে যতক্ষণ মা বাড়ী ফিরতে না বলতেন ততক্ষণ মায়ের কাছেই থাকতাম ও বাড়ী ফিরে এসে, আবার কতক্ষণে মায়ের কাছে যাবো—এই ছিল মনের চিন্তা। ভোরে উঠেই মায়ের কাছে উপস্থিত হতাম। কি আনন্দেই যে কয়েকটা দিন কাটলো—হাতে গোনা দিন আনন্দে ভরপুর!

১৬

মধু দাদার দইয়ের হাঁড়ি

ইতিমধ্যে, রবিবার মিলন-মন্দিরের উৎসব পড়লো ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্ক কলোনীতে ফুলদির বাসায়।

মা এসেছেন—মায়ের আগমন-উপলক্ষ্যে এবার বিশেষভাবে সারাদিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এখানেই বিরাজ করছেন মায়ের কৃষ্ণগোপাল নীলমণি। আমরা সবাই মায়ের সাথী হয়ে চললাম ফুলদির বাড়ী। এখানে পৌঁছে আমরা ভাইবোনেরা মাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলাম। শ্রীশ্রীমায়ের বরণ ও অভিষেক হল—অতি সুন্দর ভাবে—অন্তরের দরদের সাথে।

বাড়ী বেশ বড় হলেও—মায়ের কৃপায় আমরা ভাইবোন তো আর কম নই—তাতে কারো কোন আক্ষেপ নেই—যে যেখানে পারছে সেখানেই জায়গা করে নিচ্ছে। যখন আমরা সবাই আনন্দে মগ্ন তখন অভাবনীয় একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। একটি ভদ্রলোক মস্তবড় এক মাটির ভাঁড়ে দই নিয়ে এলেন। মাটির পাত্রটা দেখতে গাঙ্গুরামের দোকানের দইয়ের হাঁড়ির

মতন ; কিন্তু, সেই লোকটি এসে বললে—"বাবু জলযোগ থেকে দইয়ের হাঁড়ি পাঠিয়ে দিলেন—শ্রীশ্রীশোভা-মায়ের ভোগে দেবার জন্যে।" দইয়ের ওপরের কাগজে কোন নাম লেখা নেই ; এমন কি, দই এর রংও জলযোগের মতন নয়। লোকটির হাতে বাড়ীর কর্ত্তার নাম ও ঠিকানা লেখা কাগজ ছিল। সেটা হাতে দিয়ে সে অন্তর্দ্ধান করলো। জনে জনে জিজ্ঞাসা করা হোল, কিন্তু, কেউই জানেনা—দই কে পাঠালো, কোথা থেকে এলো। শেষে সবাই মিলে ঠিক করল—মায়ের সুসন্তান প্রভাতদাই পাঠিয়েছেন ; কারণ, তার বাড়ী গাঙ্গুরামের মিষ্টির দোকানের পাশেই—গোলপার্কের কাছে। প্রভাতদাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও অস্বীকার করেন। ঠিকানা-লেখা কাগজটা দেখতে চাইলেন। কাগজটা দেখে বললেন—"এই দেখো, নামের বানান ভুল রয়েছে। আমি পাঠালে কি নামের বানান ভুল করে পাঠাবো?" সকলে ভাবলে, তাইতো? আজ পর্যন্ত সেই দই কে পাঠালো জানা যায় নাই—মা-মণি তাঁর নিজের ভাবটি নিয়েই রইলেন—ধরা ছোঁওয়া দিলেন না। তবে, সেই দই যখন প্রসাদরূপে পেলাম—অতি চমৎকার সুস্বাদু দই—এতদিন কোলকাতায় আছি, এ রকম দই বাজারে পাওয়া যায় বলে ধারণাই ছিলো না। হাতে দইয়ের সুগন্ধি লেগে ছিল!

কেউ যখন এ দই পাঠান নি—তাহলে, শ্রীশ্রীমধুসূদন দাদাই পাঠিয়েছিলেন—তুমি কি বল মা?"

মাগো! কত অবিশ্বাসী মন আমাদের, তোমার লীলা বুঝবার সাধ্য কই? তুমি হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে সব জিনিসটাই লঘু করে দিয়ে স্বরূপ ঢাকতে চাও। সেই তোমার মোহিনী মায়ায় ভুলে তোমার স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি না—অন্তরে তোমার ভাব গ্রহণ করতে পারি না। মাগো, খেলার ছলে দূরে ঠেলে দিও না আমাদের—ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নাও আমাদের—এই মিনতি করি।

সেদিন মায়ের উপস্থিতিতে মিলন-মন্দিরের উৎসব বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল—

গানে গানে। তারপর, মায়ের স্বহস্তের বাতাসার লুটের বাহারে—লুটের বাতাসার সাথে মায়ের আশিস্ ঝরে পড়লো সবার মাথার উপরে। আনন্দময়ীর সাথে আনন্দে মেতে আমরা পণ্ডিতিয়ার বাড়ীতে ফিরলাম।

জয় মা—তোমারই জয়—ভুবনময়।

১৭

অন্তর্ধ্যামী মা

মাগো! তোমার কথা লিখতে গেলে তার আদি কোথায়, অন্ত কোথায় তা আমি জানিনা। তবু, পরম নির্ভয়ে তোমার হাত ধরে চলেছি—সে হাত তুমি ছেড়ে দিও না। মাগো—তোমার চরণে এই মিনতি জানাই।

তারিখ ছিল ১৯।২০ সেপ্টেম্বর—শ্রীশ্রীমা সেদিন বেনারস রওনা হয়ে যাবেন। খুব ভোরে চলে এসেছি মায়ের কাছে। কারণ, সেখান থেকে মা যাবেন লেক্ টাউনে, তাঁর দাদার বাড়ীতে—ছোট্ট জুঁই ও কিষাণের একান্ত ইচ্ছায়—ওখান থেকে ষ্টেশনে রওনা হয়ে যাবেন।

ডাক্তার-দাদার গাড়ীতে মায়ের সাথে লেকটাউনের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। কর্ম্মব্যস্ত ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও, যখনই সময় পেতেন, পরিবারের সবাইকে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে চলে আসতেন এবং সাধারণ কথাকেও মজার কথায় পরিণত করে সবাইকে আনন্দে রাখতেন। মায়ের উপর আছে অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। ওঁকে বলতে শুনেছি—"আর যেখানেই যাই না কেন মনে হয় পরের বাড়ীতে গিয়েছি—এখানে শ্রীশ্রীশোভা-মায়ের কাছটিতে এলে মনে হয় নিজের আপন বাড়ীতে এসেছি—মায়ের কাছে।"

মাগো! প্রতি জনের মনে তুমি দিয়েছ একই চিন্তা-ভাবনার ঠাঁই—কত আপন তুমি—তোমার মত আপন যে আর কেউ নন।

পণ্ডিতিয়ার বাড়ী থেকে রওনা হবার আগে—মা কিন্তু আমাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে গেলেন। আর দিয়ে গেলেন পরিপূর্ণ নির্ভরতার স্বাধীনতা।

পূজার মধ্যে জিনিসটা পেলে ভাল হয়—আশ্রমিকা বোনেদের তাই ছিল মনোগত ইচ্ছা—কিন্তু, শ্রীশ্রীমা সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক্।

লেক টাউনের বাড়ীতে ঢুকতেই দেখলাম, বাড়ীর সামনেই বেশ সুন্দর একটি ফুলের বাগান ও বারান্দা। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলাম—মায়া বৌদি খুব সুন্দর করে মায়ের আসনের সামনে আলপনা চিত্রিত করে রেখেছেন। বৌদি মাকে আরতি করে বরণ করলেন।

এ সময় মায়ের মুখ অনবদ্য শ্রী:তে মণ্ডিত হয়ে মহাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায়—মা তখন এ জগতের কেউ নন বলে মনে হয়।

ডাক্তার-দাদা নিজেই শ্রীমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। মা আসন গ্রহণ কোরবার পর, মায়ের চরণে প্রণাম করে বিদায় চাইলেন। মনে হচ্ছিল, মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে খুবই অভিভুত হয়ে পড়েছিলেন। মাও তাঁর ছেলেকে এগিয়ে দিতে এলেন গাড়ীর কাছে—তাঁর বরাভয় হস্তটি তুলে—ছেলের যাত্রাপথ ও জীবনপথ মঙ্গলময় করে তুললেন। গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেলে শ্রীশ্রীমা ঘরে এসে বললেন—"অতি স্নেহের ও আপন জন চলে গেলে যেমন বুকের মধ্যে ব্যথা করে, আমার এই ছেলেটি চলে যাওয়াতে সে রকম বোধ হচ্ছে।"

ধন্য ডাক্তার-দাদা, তুমি ধন্য! তোমার নিজগুণে, পরম নির্ভরতায় ও আন্তরিকতায় শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরে গভীর স্থান করে নিয়েছ। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা-আশিসে তোমার সাথে আমরাও সবাই ধন্য!

বাড়ীর কাছেই খুব সুন্দর একটা পার্ক ছিলো। মায়ের সাথে আমরা সবাই সেখানে যেয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম। শিবুভাই, দিদিভাই—সবাই মায়ের ভোগের বন্দোবস্তে ব্যস্ত ছিলেন। লেক টাউনের অনেকেই এসেছেন শ্রীমাকে দর্শন করতে। তারা চলে গেলে শ্রীশ্রীমা নির্দ্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম করতে গেলেন। পূজা, ভোগ, আরতির শেষে—মা প্রসাদ নিতে বসেছেন—আমাদের সবার জন্যে বাইরের ঘরে প্রসাদ পাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আমি বাইরের বারান্দায় বসে ফুলের শোভা দেখ্ছিলাম—মন চলে গেল সুদূর অতীতে। আমার

গর্ভধারিণী জননীর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো—শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের সাথে কোথায় যেন একটা বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। আমার গর্ভধারিণী মা আর ইহ জগতে নাই; তাই, শ্রীশ্রীশোভামায়ের কাছে এলে আমার সব সময় মনে হয়—মা হারিয়ে আবার মা পেয়েছি—সংসার-জীবনে এত আপন আর কেউ নেই। বড় হয়েও, মা খেতে বসলে, মাঝে মাঝে যেয়ে সাগ্রহে হাত বাড়াতাম এক গ্রাস 'দলার' জন্যে—মাও হাসিমুখে ভাত মেখে 'দলা' বানিয়ে হাতে তুলে দিতেন। ঠিক সেই সময় আমার মন আকুলি-বিকুলি করে উঠলো শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ এক গ্রাস 'দলার' জন্যে। তীব্র ইচ্ছা মনের মাঝে নিয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ কানে এলো—"রেণুকাদি, মা তোমাকে তাঁর ঘরে ডাকছেন।" মায়ের ঘরে ঢুকবো কিনা ঢুকবো ভাবছি—এমনি সময় মায়ের আহ্বান এলো—"রেণুকা, এসো"। দেখলাম, শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। মা সেই ঘরের একটী পাশে জায়গা করে, শ্রীহস্তে প্রসাদ সাজিয়ে দিয়ে, বসতে বললেন। মাকে প্রণাম জানিয়ে, জয়-মা করে, বসে পড়লাম।

শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তের দান—প্রসাদের স্বাদ ও গন্ধই আলাদা—মৃদু চন্দন-গন্ধ-যুক্ত। সবার সাথে প্রসাদ নেবো বলে বসেছিলাম—কোথা থেকে মনে হোল মায়ের হাতের 'দলা'-প্রসাদ পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা; আর অমনি অন্তর্যামী শ্রীশ্রীমা আমার অন্তরের কথাটা বুঝে নিয়েছিলেন। নাই বা পেলাম দলা-প্রসাদ—আমার স্থির বিশ্বাস, আমার মনের বাসনাটা একটু দেরীতে এসেছিল—শ্রীমায়ের প্রসাদ পাওয়া তখন হয়তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারই পরিবর্তে মা স্বহস্তে পরিবেশন করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

আনন্দে অন্তর পরিপূর্ণ—অশ্রুতে পূর্ণ নয়ন! বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না—কি করে তার বিশদ ব্যাখ্যা করবো?

সেদিন বামপন্থীদের একটা বড় মীটিং থাকাতে আমরা বেলা তিনটার মধ্যেই ষ্টেশনে বেরিয়ে পড়লাম—পথে শোভাযাত্রায় আটকিয়ে যাবো বলে। শ্রীশ্রীমা যাবেন তুন এক্সপ্রেসে। প্রতিবারই বেনারস ফিরবার পথে মা সন্তানদের

সুবিধার জন্যে, নিজের কষ্ট স্বীকার করে ও ৩।৪ ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকেন—মায়ের বহু সন্তান তখন ষ্টেশনে আসেন মায়ের চরণ দর্শন করতে।

ঐ সময় ও হাওড়ার যত কাছে পৌছাতে লাগলাম, দেখ্‌লাম ভিড়ে ভিড়—গাড়ীতে গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ। হাওড়া ব্রিজের মাঝামাঝি এসে গাড়ী অচল অবস্থা। হাওড়া ব্রিজের জ্যামের কথা শুনেছি, কিন্তু, প্রত্যক্ষ করিনি—শ্রীশ্রীমা আমাকে সেদিন—সর্ব্ব অবস্থা শান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে—এই শিক্ষাই দিলেন।

মাঝপথে আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। আমার কোন চিন্তা নেই—মা'ই তো রয়েছেন! কিন্তু, মা আমার জন্যে নিজেই অস্থির—বার বার সাবধান করছেন—"আস্তে এসো, আমার সাথে এসো—তোমার পায়ে ব্যথা।"—কি যে ভাল লাগছিল। মায়ের স্নেহের রূপটি সারা অন্তর দিয়ে অনুভব কোরছিলাম।

ষ্টেশনে জায়গা-মত পৌছে মন বড়ই খারাপ হয়ে গেলো—মা তো আর খানিকক্ষণ বাদেই রওনা হয়ে যাবেন! কয়েকদিনের আনন্দের মাঝে বিষাদ এসে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো—বুকের ভেতর ব্যথা করে চোখে জল আসতে লাগলো। শ্রীমায়ের সামনে যেয়ে দাঁড়াতে পারছিনা—মায়ের সামনে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি—অন্তর্যামী মা কিন্তু ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন আমার অবস্থা।

রওনা হবার আগে যে প্রসাদ আমায় দিলেন আমার অন্তরে চির-জাগরুক থাকবে। স্নেহ, করুণা, ভালবাসা ও আশিসের সবটুকু ঢেলে দিলেন স্পর্শের মাধ্যমে!

অমৃতময়ী, অন্তর্যামী, অন্তরবাসিনী মাগো! যে মন তোমার করুণা-কৃপায় আপ্লুত হয়েছে, সেই মনকে তোমারই চরণে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণের উপযুক্ত করে নাও। দীন, হীন, নম্রচিত্তে সন্তানের আব্দার নিয়ে, যেন তোমারই চরণে আশ্রয় নিতে পারি। চলার পথে যেন শুধু তুমি-ময় অনুভূতি দিয়ে পৌছাতে পারি তোমার চরণকুলে—এই আশীর্ব্বাদই ভিক্ষা করি।

শূন্যমনে, পূর্ণ অন্তরে, ফিরে এলাম বাড়ীতে—নির্জ্জনতার বড় দরকার ছিল আমার। আগামী কাল শ্রীশ্রীমাকে আশ্রমে পেয়ে আনন্দ-উজ্জ্বল আমার দিদিমার ও বোনদের মুখগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

জয়গুরু!

১৮

স্বপ্নে দর্শন

বাড়ী ফিরে এসে মনটা বড়ই উদাস লাগছিলো। কয়েকটা দিন যে বাস্তব স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেলো—মা-মণির সাথে এই কয়েকদিনের সুখ-আনন্দ-স্মৃতির মাঝে—মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখলাম—শ্রীশ্রীমা যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু, একি দেখতে পাচ্ছি—শ্রীমায়ের রূপ আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীরূপে রূপান্তরিত হলেন—মুখের হাসিতে দুষ্টুমি-ভরা অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ঘর ভরে গেলো। কানে শুনতে পেলাম—'কি রে, বেনারস যাবি তো? আমার মুখদর্শন করবি তো?' তিনবার আমার কথাটা কানে গেলো। আমি যেন ঘুমের মধ্যেই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। একটু পরেই যখন জেগে গেলাম—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো প্রতিজ্ঞার কথা। তাইতো, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—শ্রীমাকেও প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়েছিলাম—মৃদু অথচ স্নেহের তিরস্কার লাভ করেছিলাম মায়ের কাছ থেকে। তাই কি শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী মাতৃ-অঙ্গে মিশে এসে আমাকে কৃপা করে তাঁর অপূর্ব্ব সুশ্রী জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমুখ দর্শন করিয়ে দিয়ে গেলেন? ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলেন আমার প্রতিজ্ঞা, জানিয়ে দিয়ে গেলেন—আমি আছি, আমি আছি, আমি যে তোর কথা রেখেছি—তোর মা ও আমি যে অভিন্ন-হৃদয়ে এক—তাঁর জন্যে যে ব্যাকুলতা সে ব্যাকুলতা যে স্পর্শ করে আমাকেও!

মাগো ! তোমার চরণে আমার অন্তরের ভক্তি, নিষ্ঠা ও প্রণাম জানাই। সেই প্রণামই যে পৌঁছাবে যেয়ে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর শ্রীচরণে।

লীলাময়ী মাগো ! তোমার কৃপায় অঘটন আজো ঘটে।

১৯

মাগো ! গভীর আবেগে যে ভাষা মনের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে, তার বাইরের রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা, তোমার আশিস্ ছাড়া কি করে হবে ? তুমি শক্তি দাও মা, শক্তি দাও।

শ্রীশ্রীমা যে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের ভার আমার পরে ন্যস্ত করেছিলেন—স্নেহের বোনদের ইচ্ছা সেটা পূজার আগে হলেই ভাল হয়। আমিও মনে মনে আশা করেছিলাম পূজার আগেই হয়তো করতে পারবো ও তাকে পাঠিয়ে দিতে পারবো। নিজেকেই কর্ত্তা সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছিলাম—কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের যে অন্যরকম মনোগত ইচ্ছা ছিল তখনও বুঝতে পারিনি অহং-এর প্রভাবে।

শ্রীমায়ের দেওয়া কাজ পূজার আগে দোকান থেকে অনেক চেষ্টা করেও ডেলিভারী পেলাম না। মন বিষাদে ভরে গেলো—পূজা পার হয়ে যাচ্ছে—সময় মত জিনিষ দু'টি পেলাম না—৺পূজার দিনের আনন্দও যেন মনে লাগলো না—ভাবছি আমি—তো চেষ্টার ত্রুটি করিনি, তবে কোথায় অপরাধ হোল ? মাগো ! তুমি আমায় বলে দাও—মায়ের শরণাপন্ন হোলাম। শ্রীশ্রীঅষ্টমী পূজার দিন বসে আছি—বেলা ১০।১১টার সময় হঠাৎ দোকানের মালিক নিজে আমার বাড়ীতে এসে জিনিস দুটির ডেলিভারী দিয়ে গেলেন ও সময়মত না দিতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমার বেনারস যাবার কোন কথা ছিলো না—একমাস আগেই ঘুরে এসেছি। জিনিস দুটো হাতে পেয়ে মন আরও খারাপ হয়ে গেলো। পর পর

পোষ্ট অফিস বন্ধ—ডাকে পাঠানো যাবে না। ডাকে পাঠাতে পারলেও অনেক দেরী হয়ে যাবে; অথচ, আমারও যে খুব ইচ্ছা ছিল পূজার মধ্যেই মায়ের এই জিনিস দুটি যেন কাজে লাগে। ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। আমার স্বামী, মায়ের বাবুজী, আমাকে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে বললেন—"তোমার যখন এত ইচ্ছা—মন খারাপ না করে, নিজেই চলে যাও না কেন?" আমি বেনারস যাবার কথা বলতেই সাহস পাচ্ছিলাম না—অনুমতি, মায়ের আশীর্ব্বাদে, এমনিই এসে গেলো। অনুমতি দিয়েই আমার মায়ের বাবুজী বললেন—"শুনছি তো হাওড়াতে পূজার ভিড়ে ষ্টেশনে পা রাখবার জায়গা নেই—যাবে কি করে?" বলেই চুপ করে গেলেন। বেলা ৩৷৪টা নাগাদ মনে তীব্র ইচ্ছা জাগতে লাগলো; অনুমতি যখন পাওয়াই গেছে—তখন ষ্টেশনে যেয়েই দেখি না কি হয়। মন স্থির করে, রওনা হোলাম ষ্টেশনের দিকে—মায়ের বাবুজীও আমার সঙ্গে এলেন, ভিড়ের মাঝে একলা ছাড়বেন না বলে। সত্যি, হাওড়া এসে লোকজনের ভিড় দেখে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ! তবুও, মা ভরসা! ঠিক করলাম—একটা থার্ড ক্লাশ টিকিট করে মোগলসরাই-গামী যে কোন ট্রেনে উঠে পড়বো। ওকে গাড়ীতে অপেক্ষা করতে বলে, আমি নিজেই মেয়েদের টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ভিড়ে এগোনই দায়, তবুও চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ কানে এলো—আমার নাম ধরে কে ডাকছে। ভুল শুনেছি বলে এগোবার চেষ্টা করছি, এমন সময় পেছন থেকে কে বল্লে—"রেণুদি, কোথায় যাচ্ছ এই ভিড়ে?" তাকিয়ে দেখি আমার পরিচিতা মঞ্জু চক্রবর্তী, রেলওয়েতে কাজ করে। আমার কথা শুনে বললে—"তুমি পাগল হয়েছ? এই ভিড়ে টিকিট কাটতে পারবে? আমায় দাও, আমি ভিতর থেকে টিকিট কিনে দিচ্ছি।" 'জয় মা' বলে আমি তারই শরণাপন্ন হোলাম—মনে হোল, শ্রীশ্রীমা এসে যেন তারই সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। কই, কত দিন তো আসা যাওয়া করছি—মঞ্জুর সাথে তো দেখাই হয় না।

ট্রেনের অবস্থা—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—যেদিকে তাকাই—ঠাসাই বোঝাই। শেষ পর্য্যন্ত, মায়ের আশীর্ব্বাদে, পাঞ্জাব মেইলের সেকেণ্ড ক্লাশে উঠতে পারলাম ও ভালভাবে জায়গা পেয়ে বেনারসে এসে পৌছালাম।

শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছাতে সবই সম্ভব—অসুরদলনী, দুর্গতিনাশিনীর কৃপা পেলে, কার সাধ্য রোধে তাঁর গতি? মায়ের মনোগত 'ইচ্ছাই আমায় বেণারস টেনে নিয়ে এলো।

শ্রীশ্রীমা শুধু সাহায্যের হাতটি বাড়িয়েই ক্ষান্ত ন'ন। সন্তানের ভালবাসায় আগ্রহ যাচাই কোরবার জন্যে—কত বাধা, কত পরীক্ষা। যত তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে যেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছি, ততই বাধা। বেনারসে ট্রেন্ পৌছাবার আগেই টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিলো—গাড়ী বেনারস ষ্টেশনে পৌছাবার আগে সে বৃষ্টি নামলো মুষলধারে। সুতরাং, ট্রেনে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। ভাবলাম, ততক্ষণ সময় নষ্ট না করে স্নান সেরে নি—তাহলে আশ্রমে পৌছেই মায়ের কাছে যেতে পারবো। মনে হচ্ছে, আমি শ্রীমায়ের ইচ্ছা মতন পরিচালিত হচ্ছি।

স্নান সেরে, বাইরে এসে দেখি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রিক্সা নিয়ে আশ্রম-অভিমুখে রওনা হোলাম। মাঝ পথে রিক্সার চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেলো—তবু সে আমাকে আস্তে আস্তে রিক্সা চালিয়ে আশ্রমে পৌছে দিল। আমি যতই চাই না কেন, মা যে সময় নির্দ্ধারিত করে রেখেছেন, তার আগে তো পৌছাবার উপায়ই নেই!

আমি যখন পৌছালাম মহা-নবমী পূজা শেষ হয়ে গেছে। আমি গেট দিয়ে ঢুকেই চীৎকার করে বলে উঠলাম—"মাগো! আমি এসেছি মা!" আনন্দে মন চঞ্চল—মনের মাঝে কত কথাই জমা হয়ে উঠেছিলো—কিন্তু, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না!

উপরে উঠেই, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করে—দেবী-দুর্লভ পদ-রজঃ মাথায় তুলে নিলাম। মায়ের চরণে মাথা রাখলে মনে হয়—ঐ ভাবেই

লুটিয়ে পড়ে থাকি জনম জনম। মায়ের মুখে দেখ্‌লাম অভয়ের হাসি—জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করে এলে? আসতে পারলে?"

'কি ক'রে এসেছি, তুমি জানো মা'—আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

ভিড়ের মধ্যে মায়ের জিনিস বুকে করে নিয়ে এসেছিলাম। বের করে চরণে রাখলাম। নূতনদি খুলেই মায়ের হাতে দিতেই—মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—"বাঃ, বেশ চমৎকার হয়েছে—আমার পছন্দ হয়েছে।" এক মুহূর্তে আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো!

মাগো! সামান্য জিনিসের জন্যেও তোমার যে পরম নির্ভরতা—তোমার কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষণীয়। মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে, তুমি যে হাত ধরে তার সে ইচ্ছা পূরণ কর, তার প্রমাণ আমার জীবনে কত স্বল্প সময়ের মধ্যেই পেলাম! তবুও, জ্ঞান-বুদ্ধি হোল কই? বৃথা অভিমানে সময় বহে যায়!

আমার মুখে, আসার বিবরণ শুনে মা হেসে বললেন—"দেখ্‌লেতো—আমার বাবুজী কত ভাল—তোমাকে এই ভিড়েও আসবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন।"

আমি বোল্লাম—বারে! আমি যে কষ্ট করে এলাম, আমি বুঝি ভাল না? আমার কথা শুনে মা-মণি সশব্দে হেসে উঠ্‌লেন; বল্লেন—"তুমি তো কষ্ট করবেই—তুমি তো এসেছ তোমার মায়ের কাছে।" এবার কিন্তু মায়ের সাথে একমত হয়ে গেলাম। আমার কিন্তু মনে হয়—মা তাঁর বাবুজীকেই বেশী ভালবাসেন। আমরা তো বারে বারে দৌড়ে আসি—কিন্তু, তিনি দূরে থেকেও মায়ের ভালবাসা ও আশিস্ পান অজস্র।

২০

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে একলা এলে মনে হয় যেন ছোট্ট শিশুটি হয়ে গেছি—নিজের বয়েসটাই ভুল—সংসারের আবিলতা থেকে মনটা হয়ে যায় মুক্ত।

মনটা চলে যায় ভাল-মন্দ বিচারের বাইরে—মনে হয়, শ্রীমাই তো রয়েছেন—আমাদের যা করণীয়—আমাদের যেটুকু দরকার, মাই তা করাবেন। তাই, পরম নির্ভাবনায় দিনগুলি কেটে যায়।

নবমী-পূজার দিন কেটে বিজয়া-দশমী এসে গেলো। সন্ধ্যায় ব্রজধামে আমরা ভাইবোনেরা শ্রীশ্রীমায়ের পদতলে একত্রিত হয়ে সন্ধ্যারতি, ভজন ও কীর্ত্তনের শেষে—মায়ের হাতের হরির লুটের বাদাম ও বাতাসার কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। মায়ের কাছে সবাই হয়ে যায় ছেলেমানুষ!

এর পর মা ৺বিজয়া-দশমীর মিষ্টি বিতরণ করলেন—সন্তান ও ভক্তদের।

সন্তানেরা সব দেহে-মনে-প্রাণে, আচার-আচরণে ও পরম-ঈশ্বরলাভ-বিজয়ী হউক—এইদিনে মায়ের থাকে পরম প্রার্থনা শ্রীশ্রীঠাকুরজী ও গুরুদেবের চরণে।

আজকের দিনে শ্রীশ্রীমা সব সন্তানদের দেন পদ-স্পর্শের অধিকার—তাঁর শ্রীচরণে মাথা রাখলে মনে হয়—যদি আজীবন এইভাবে থাকতে পারি!

শ্রীশ্রীমাকে প্রণতি দিয়ে, পরমশ্রদ্ধেয়া দিদিমার চরণে প্রণত হবার পরই—পড়ে যায় প্রণামের কাড়াকাড়ি—কোলাকুলির হুড়াহুড়ি! সন্ত-আশ্রম-প্রাঙ্গণে এ দৃশ্য যে না দেখেছে, সে বুঝতে পারবে না। সব জিনিসটার মধ্যে রয়েছে গভীর অন্তরঙ্গতা—একই মায়ের ছায়ায়, মনের বন্ধনে, যে সবাই জড়িত! শ্রীশ্রীমা তাঁর স্নেহের, করুণার বন্যায় সব সন্তানদের মনে আনন্দের জোয়ার এনে দিয়েছেন!

শ্রীশ্রীমায়ের বহু ভক্ত ও সন্তান পূজা-উপলক্ষ্যে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন—মা সবাইকে নিয়ে বাসে বিন্ধ্যাচল ও চূণার যাবেন বলে ঠিক হোল—আমরা সবাই উৎসাহে মেতে উঠলাম। শ্রীমায়ের উৎসাহের অন্ত ছিলো না—মায়ের উৎসাহ ছিল আমাদের থেকেও অনেক বেশী। এতজন যাবেন—তাদের প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করা—কখন রওনা হতে হবে—বাস রিজার্ভেশন ইত্যাদিতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা দিলেন।

আমরা ভোর ৬টা। ৬-৩০টার সময় রওনা দিলাম বাসে, বিন্ধ্যাচলের দিকে।

শ্রীশ্রীমা গোপেনদার গাড়ীতে রওনা দিলেন বাসের আগে আগে—পথ-প্রদর্শক হয়ে। জীবনের পথ-প্রদর্শক গুরু—সর্ব্ব সময়ের, সর্ব্ব পথেরই পথ-প্রদর্শক তিনি।

বাসের একটু দেরী দেখলেই মাঝপথে গাড়ী থামিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মা—সন্তানদের জন্যে উদ্বেল, ব্যাকুল অন্তরে। বাসের মধ্যেই সবাই নাম-গান ও ভক্তিমূলক গান কোরছিলেন—যাবার পথে পথে যেন আনন্দ-লহরী ছড়িয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি, 'মা' গাড়ী থামিয়ে আমাদের বাসে উঠে এলেন। কি আনন্দ, কি আনন্দ! মা আসাতে নামের ও গানের উৎসাহ সবারই দ্বিগুণ বেড়ে গেলো—মায়ের নাম-গানে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন।

সন্তানদের মা তাঁর সঙ্গ-সুখ থেকে কখনই বঞ্চিত করতে চান না—নিজের সঙ্গদান করে যান—নব নব প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে ভরে!

শ্রীশ্রীমাকে বুকে নিয়ে বাসও ছুটে চললো দ্বিগুণ উৎসাহে। কিছুক্ষণ পরে সবাই মাকে অনুরোধ করলেন—"মাগো, তুমি এবার গাড়ীতে যাও—তোমার বাসে কষ্ট হচ্ছে।" শ্রীশ্রীমায়ের স্থূল-দেহ এমনিই ভাল যাচ্ছিল না—তারপর গেছে পূজায় উৎসবের ক্লান্তি। আর খানিকক্ষণ বাস চলবার পর, মা লক্ষ্মীমেয়ের মতন আমাদের কথা মেনে নিলেন।

বিন্ধ্যাচলে পৌছে আমরা গেলাম শ্রীশ্রীবিন্দুবাসিনী দর্শন করতে। শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় দর্শনের কোনই অসুবিধা হোল না—ভিড় থাকা সত্ত্বেও। রাজরাণী বিন্ধ্যেশ্বরী বিন্দুবাসিনী তাঁর ঐশ্বর্য্যের রূপটি নিয়ে বসে আছেন অপূর্ব্ব মহিমায়—তাঁর সামনে স্তূপাকার করে গম জ্বালানো হচ্ছে, যজ্ঞ হিসাবে।

এখানে এসে আমার পিতৃদেবের কথা খুবই মনে হচ্ছিল। তিনি ছিলেন পরমভক্ত। বিন্ধ্যাচল ছিল তার অতি প্রিয় জায়গা—প্রতি পূজার ছুটিতে এখানে আসতেন। শ্রীশ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী বিন্দুবাসিনী দেবী ছিলেন তার উপাস্যা জননী।

সচল বিন্দুবাসিনী আমাদের মাকে প্রণাম জানালাম—অন্তরের অন্তরে—আর প্রণাম জানালাম আমার স্বর্গীয় পিতার চরণে। তারপর, মাতৃসমভিব্যাহারে আমরা সুপ্রসিদ্ধ মহা-অষ্টাভূজার মন্দির দর্শন করতে গেলাম। প্রায় ১০৮টি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হয়—মন্দিরে যেতে হ'লে। কিন্তু, আমি নীচে বসে রইলাম—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবো না ভেবে। যদি চেষ্টা করে উঠলে আমার শরীর কোন রকমে খারাপ হয়, তবে আমার জন্যে সবার অসুবিধা হবে—সেও ছিল আর এক চিন্তা। পরে মনে ভেবে দেখেছি, সত্যিই আমি মূর্খ—মায়ের সাথে গেলে আমার কোন অসুবিধা হোত না—সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাসটুকু কেন রাখতে পারলাম না!

সবাই মন্দির-দর্শন করতে চ'লে গেলেন—আমি বসে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি কোরছিলাম—পাহাড়-জঙ্গলের রূপ বড় অপূর্ব্ব! পুরানো দিনের স্মৃতি এসে ভিড় করছিলো—তখন এসব জায়গা এত জনবহুল ছিলোনা। আর, দেখছিলাম শ্রীহনুমানজীদের যাওয়া আসা—বিচিত্র গতি, ভঙ্গী। মুখখানি দেখলে মনে হয়—সাদাসিদে নিপাট মানুষ—কিন্তু, দরকার হলে সোজাসুজি কাছে এসে নিজেদের দাবী মিটিয়ে নেন—তখন আর না কোরবার উপায় থাকে না।

শ্রীশ্রীঅষ্টভূজার মন্দির দর্শন করে শ্রীমায়ের সাথে সবাই ফিরে এলেন। আবার যাত্রা সুরু হোল কালীক্ষোয়া মন্দিরের দিকে—পাহাড়ের পথ দিয়ে বেশ খানিকটা যেতে হয়। মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত বাস যায়। আমরা সেখানে যেয়ে প্রসাদ পাবো বলে কথা হোল। মন্দিরের কাছে যেয়ে গাড়ী থামাল। সবাই আমরা নেমে এলাম। মন্দিরের প্রধান পূজারী শ্রীশ্রীমাকে পেয়ে বিশেষভাবে ভোগারতি করলেন। এখানে শ্রীশ্রীকালীমায়ের মূর্ত্তির কিন্তু বিশেষত্ব আছে। কালীক্ষোয়া মন্দিরের কুয়ার জল—পেটের উপকারিতার জন্যে বিখ্যাত। জলের গুণের জন্যে বহু দূরদূরান্ত থেকে লোক আসেন কুয়ার জল নিতে।

শ্রীশ্রীমায়ের সাথে আমরাও শ্রীশ্রীকালী মায়ের আরতি দর্শন কোরলাম।

সেই সাথে দর্শন কোরলাম আমাদের অনন্তশ্রী মাকে—বিশেষ স্থান-মাহাত্ম্যে মায়ের রূপটি ফুটে ওঠে অচিন্তনীয় সুন্দরভাবে !

শ্রীমায়ের বিশেষ ব্যবস্থায় মন্দিরের চত্বরে ও বারন্দায় আমরা সবাই পাতা পেতে বসে গেলাম—প্রসাদ পাবার জন্যে। হঠাৎ দেখলাম মা নিজের হাতে লুচি পরিবেশন করছেন। ভাবছি, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—আমার মায়ের কিন্তু, শ্রীদেহ খারাপ থাকা সত্বেও কোন ক্লান্তি নেই।

পরে শুনেছি, যত লোকের জন্যে প্রসাদ আনা হয়েছিল তার থেকে লোক-সংখ্যা ছিলো অনেক বেশী। শ্রীশ্রীমায়ের কানে সেই কথা যেতেই, নিজের হাতে প্রসাদ-বিতরণের ভার তুলে নিয়ে অভাবটুকু পূরণ করে দিলেন—অন্নপূর্ণা মা আমাদের !

সেই প্রথম নয়—আরো বহুবার এ রকম হয়েছে ; প্রসাদের স্বল্পতা, মার পরিবেশনের গুণে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়েছে বলে দেখা গেছে! জয় মা ! গুরুর প্রতি তোমার পরম নির্ভরতাই—তোমার সব অভাব মিটিয়ে দেয়—তুমি হও অন্নপূর্ণা মা আমাদের !

প্রসাদ পেতে বসে কারো তো কিছু অভাব হোলই না—পরিতোষপূর্ব্বক, লুচি, আলুর দম, চাট্‌নী, রসগোল্লা—যে যত পারে গ্রহণ করে ও—মন্দিরের লোকজন, বাস ও গাড়ীর ড্রাইভাররা সবাই প্রসাদ পেলেন প্রাণ-ভরে !

প্রসাদ পেয়ে আমরা কুয়ার জল পান করে দেখলাম, অতি সুস্বাদু জল। মন্দিরের প্রাচীরের বাইরে, ধাপে ধাপে উঠে একটা সিঁড়ি ছোট্ট মন্দিরে যেয়ে শেষ হয়েছে। সেটা হচ্ছে রামসীতার মন্দির—তারই পাশে আছে গরম জলের ঝরণা—ক্ষীণ ধারায় বয়ে আসছে নীচের দিকে।

কালীক্ষোয়া মন্দিরের পরিবেশটি বড় সুন্দর—পাহাড়ে ঘেরা, নির্জ্জন, শান্ত পরিবেশ।

শ্রীশ্রীমায়ের জয় দিয়ে—আমরা চুণার ফোর্টের দিকে রওনা হোলাম।

চুণারের নিস্তব্ধতা এখন আর নেই, হয়েছে জনবহুল—সাদাসাদা লাইম-ষ্টোন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

আমাদের বাস এসে থাম্‌লো চুনার ফোর্টের পাদদেশে—আগে আমরা ফোর্ট্ দেখতে গেলাম। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠতে হয়। প্রতি পদক্ষেপে মা আমাকে সাবধান করছেন—আস্তে আস্তে উঠতে বলছেন। উপরে সমতল জায়গায় এসে গঙ্গাজীর দর্শন পেলাম। এখানে গঙ্গার রূপ দেখলে মন কেড়ে নেয়—একটা বাঁক নিয়ে গঙ্গা ঘুরে গেছে দেখলাম। বর্ষার জলধারার সাথে গঙ্গাজী হয়ে উঠেছেন পরিপূর্ণা—তাঁর বিশাল বিশুদ্ধ রূপটি নিয়ে। গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। বসে বসে গঙ্গামায়ের শোভা দেখছিলাম—সেখান থেকে ফিরতে মন চাইছিলো না।

বিশেষ কারণে, গঙ্গার অবগাহন-স্নানটি হোল না। বেলা পড়ে আসছিলো—গঙ্গাজীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অবগাহন করে মনটি ভরে নিয়ে এলাম।

ফিরে এলাম বেনারসে, মুগ্ধ মন নিয়ে! আসবার পথে, রামনগরে দুর্গামন্দিরে শ্রীমা গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে রামনগরের রাজার সঙ্গে দেখা হ'ল। মহারাজা গাড়ীতে বসেই শ্রীমাকে দেখে হাত দুটি তুলে প্রণাম ক'রে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জানান।

মাগো! তুমি সাথে থাকলে প্রকৃতিও বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠেন। মনের মাঝে উপ্‌চে ওঠে তার করুণা-রাশির প্রকাশ—দিকে দিকে রূপে, রসে, গন্ধে, ভরপুর হয়ে!

২১

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-পূজা

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-পূজা, আশ্রমের সবাই ব্যস্ত আয়োজনে। শুনলাম, এবারকার পূজা গোপাদির সঙ্কল্পে হচ্ছে।

মায়ের এই অকর্ম্মা মেয়েটি সুযোগ-সুবিধা পেলেই মায়ের কাছটীতে যেয়ে

বসে থাকি—আর মা-মা ডেকে মনের সাধ মিটিয়ে নিতে চাই—আর চাই অন্তর পরিপূর্ণ করে নিতে!

মা ডাকের যে আদি অন্ত নেই। যুগ যুগ ধরে কত সাধকই, কত ভাবে মাকে ডেকে এসেছেন—তবুও, যুগ যুগ ডাকবার তীব্র বাসনাতে মন মাতৃভাবে ডুবে থাকবে!

আমি মায়ের পেটুক মেয়ে—পূজার থেকে প্রসাদ পাবার দিকেই বেশী লক্ষ্য। ভাইয়েরা পূজা-উপলক্ষ্যে বাজী নিয়ে মেতে আছে—সাথে সাথে মা-মণিও। মায়ের এই ছোট্ট শিশুরূপটি দেখতে এত ভাল লাগে—মনে হয় যেন মা যশোদা হয়ে গোপালকে কোলে তুলে নিই!

প্রসাদ পাবার ঘণ্টা বাজতেই ঠিক জায়গা মতন পৌছে গেলাম। লুচি, আলুরদম, ছোলার ডাল, বেগুন-ভাজা, চাট্‌নী, পায়েস—প্রসাদ পেলাম। সত্যি, মায়ের আশ্রমের মিষ্টান্নের স্বাদই আলাদা। প্রতি উৎসবে মিষ্টান্নের লোভেই বেনারস যেতে ইচ্ছা করে! তবে, একটা কথা বলে রাখি—বাড়ীতে কিন্তু আমি পায়েসের ভক্ত মোটেই নই। আমরা সব সিঁড়ির নীচে বসে আছি —রামকৃষ্ণদাও সেখানে উপস্থিত। এমনি সময় 'মা-মণি' সেখানে এলেন। এসেই রামদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কই রামকৃষ্ণ, তোমার তো মিষ্টান্ন-প্রসাদ খাওয়া হয়নি।"

রামদা, আমরা,—সব এক সাথেই প্রসাদ পেয়েছিলাম। রামকৃষ্ণদার খাবার গল্প অল্প-বিস্তর সবাই জানেন। তিনি হিন্দু-হোষ্টেলে আমার দাদার সহবাসী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে সহপাঠী ছিলেন। দাদার কাছে শুনেছি—সে সময় ইচ্ছা হলে, হিন্দু-হোষ্টেলের সব ছেলের খাবার একাই শেষ করে দিতে পারতেন। সেই রামদা—প্রসাদ পাবার সময় বিশেষ পরিমাণের কৃপা থাকতো তার জন্যে।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনে রামদা বল্লেন—"তুমি তো দাও নি, তুমি একটু দেবে নাকি?"

শ্রীমা ছোটখাট একটি গামলা—সের ৩।৪ পায়েস ধরে—রামদার সামনে এগিয়ে দিলেন।

রামদা বললেন—"মাগো! অ্যাতো—!"

মা বললেন—"পেরে যাবে, বসে যাও।"

রামদা নিঃশব্দে বসে গেলেন ও নিঃশব্দে চেটেপুটে শেষ করে দিলেন।

রামদার পায়েস খাওয়া দেখে আমারও কেমন ইচ্ছা হতে লাগলো। মুখ ফুটে বলেই ফেললাম—"মাগো! তোমার হাতে আমায় একটু পায়েস দাওনা!" বলে, হাত পাতলাম—শ্রীমা কিন্তু ছোট একটি প্লেটে আমাকে বিতরণ করলেন।

মা যে জানেন তাঁর সন্তানদের কার কতটুকু প্রয়োজন।

তারপর দিন ভোরে রামদার সাথে দেখা হতে, তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করাতে, উত্তর দিলেন—"খুব ভাল আছি। জান রেণু, মায়ের স্বহস্তের দান—প্রসাদ—পরিমাণে যতই হোক্ না কেন—এক এক সময় মনে হয় পেট থেকে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত ভরে গেছে—কিন্তু, কখনই শরীর খারাপ হয় না। আর বিশেষ মজা হচ্ছে কি জানো? প্রসাদ নেবার সময় মনেও হয় না যে আর পারছি না—শ্রীশ্রীমায়ের কৃপার বিশেষত্বই এই!"

সত্যিই, মায়ের এই স্নেহময়ী, সংসারের রূপটি, অপূর্ব্ব! মায়ের সন্তান তো গুণতিতে কম নয়, অথচ, মা ঠিক সবাইকে সমান আদর করছেন—সমান ভাল বাসছেন—যেটুকু যার প্রয়োজন না চাইতেই মিটিয়ে দিচ্ছেন; আবার সংশোধনের জন্যে করছেন শাসন—যাতে অভিমান দূর হয়!

আমরা ছোট সংসার নিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত; শ্রীমা তাঁর বৃহৎ সংসার নিয়ে শান্ত, আনন্দিত!

বহুরূপে মা, বহুধারায় মা—শ্রীশ্রীমাই যে তাঁর মাতৃত্বের বিরাট পরিচয় ও উদাহরণ! সেই মাকে জানাই আমার একটি প্রণাম। একটি প্রণামের মাধ্যমেই যেন আমার সকল দেওয়ার শেষ হয়—সেই আশীর্ব্বাদই করো মা-মণি!

২২

আমাদের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে, বাসনা-কামনা পূর্ণ হলেই মনে ভাবি—কল্যাণময়ী মা, মঙ্গলময়ী মা! কিন্তু, মা যে রয়েছেন সর্ব্বঘটে—আনন্দ-সুখের মাঝে ও যেমন, দুঃখ-বেদনার মাঝেও তেমনি—কল্যাণময়ী, মঙ্গলময়ীরূপে!

বাসনা-কামনা-অপূর্ণতার মাঝে, দুঃখ-বেদনার মধ্যে—কত ভাবে পেয়েছি শ্রীশ্রীশোভামায়ের মঙ্গলময় ইঙ্গিত ও পরম আশীর্ব্বাদ। কঠিন পরীক্ষার মাঝ দিয়ে মা যে আমাদের মনকে গড়ে তুলছেন—এগিয়ে দিচ্ছেন—শিখিয়ে দিচ্ছেন পরম নির্ভরতায় মঙ্গলময়ের দিকে এগিয়ে যেতে।

শুধু আদর দিলে যে শিশু মাথায় চড়ে বসে। তাঁকে ভালবাসা যেমন প্রয়োজন—শাসন করাও তেমনি প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনেও।

লক্ষ্মী-পূজার পরে কথা হচ্ছে—শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবন যাবার। অনেককেই ডেকে ডেকে বৃন্দাবন যাবার কথা বলছেন—কিন্তু, আমি ভাবছি, মা কই আমাকে একবারও বলছেন না যাবার কথা! মা একবার বল্লে আমিও যেতে পারি। কিন্তু, তার জন্যে মায়ের কাছে ছিল না কোন অভিযোগ—যা ভাল বুঝবেন মা তাই করবেন।

লক্ষ্মী-পূজার একদিন পরে, সকালে মঙ্গল-আরতির পরে বসে আছি—শ্রীশ্রীমা মন্দির-প্রদক্ষিণ করে সন্তানদের প্রসাদ দিতে গিয়েছেন। আমি মাতৃভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর দিকে চেয়ে রয়েছি। সেই অবস্থায় দেখতে পেলাম—ঠাকুরজীর চোখ দুটি ছল ছল করছে—চোখে নেমে এল ২।৩ বিন্দু অশ্রুর ধারা! আস্তে আস্তে সে ভাব মিলিয়ে যেয়ে আবার চোখ দু'টি হাসিতে ভরে উঠলো।

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেলো—কেন এইভাবে ৺শ্রীশ্রীঠাকুরজী আমাকে দর্শন দিলেন? আমার বড় ছেলে এয়ারফোর্সে আছে—ভাবছি কোন খারাপ

খবর পাবো কিনা— ? মনটা বিচলিত হয়ে উঠলো—নাম-জপে আবার আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেলো।

মনে মনে ঠিক কোরলাম শ্রীশ্রীমাকে জানাই, তিনি কি বলেন। শ্রীমা মাতৃধামে বসে ছিলেন—সুযোগ মত মাকে দর্শনের কথা ও আমার চিন্তার কথা বলতেই, মা বল্লেন—"তুমি চিন্তা কোর না।"

ছোট্ট একটু কথা—কিন্তু, মনে হোল—সব চিন্তার ভার নিজেই নিয়ে নিলেন। মায়ের আদেশে তার পরদিনই শ্রীমান প্রসাদের সাথে কোলকাতা রওনা হয়ে এলাম। মা বিকালে বললেন—"রেণু, তোমার টিকিট করা আছে, তুমি প্রসাদের সাথে কোলকাতা যাবে, তোমাকে একা পাঠাবো না।"

বাড়ীতে পৌঁছে শুনি—বেনারসে যেদিন আমার ঐরূপ দর্শন হয়েছিল—তার আগের দিন রাত্রে আমার স্বামীর মাথায় ও বাম চোখে অত্যন্ত যাতনা হয় ও সাময়িকভাবে ঐ চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। ডাক্তারের মতে অতি কঠিন গ্লোকোমা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন—এর আগে কোন লক্ষণই বোঝা যায় নি—অপারেশন দরকার হবে।

মাগো! সেই সময় আমি বুঝতে পারলাম, কেন তুমি আমায় বৃন্দাবন যেতে বলোনি। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর মাধ্যমে কৃপা করে দর্শন করিয়ে দিয়ে, সাময়িকভাবে তোমার বাবুজীর ক্লেশ ও যাতনার উপশম করিয়ে দিলে।

মাগো মা! কতরূপে, কতভাবে তোমার ব্রজধামে দর্শন ও শ্রবণ করালে —একি আমার মনের ভুল? না, তোমার করুণা, কৃপা? আমি তোমার অযোগ্য সন্তান; সাধন জানিনা, ভজন জানিনা, অন্তর আমার সংশয়ে আবৃত তবু, এ অনন্ত কৃপা কেন করলে, মাগো? যে কৃপা তুমি করেছ, মাগো—এ অন্তর যেন মাতৃভাবে তোমাময় হয়ে যায়—সে কৃপা থেকে বঞ্চিত করো না আমায়—তোমার চরণে, শরণে এই প্রার্থনা রাখি!

২৩

শ্রীশ্রীমা সন্তানদের সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বভাবে তৈরী কোরবার জন্যে বাধা-বিঘ্ন দিয়ে, পরীক্ষা করে যান। তাই, মায়ের কৃপায়, আমার জীবনে চলার পথে সস্নেহে কত সমস্যাই বিছিয়ে রেখেছিলেন ও রাখছেন—আমাকে যোগ্যা করে তৈরী কোরবার জন্যে। সুখের মধ্যে তাঁর কৃপা যেমন পেয়েছি—দুঃখ-বিপদের মাঝে সমভাবে, পরীক্ষার মাধ্যমে, তাঁর কৃপা পেয়েছি। তিনি যেমন প্রতিকূল আবহাওয়ার মহাপরীক্ষার সৃষ্টি করেন—তেমনি সন্তানের আকুল আহ্বানে, পরম শরণে, সেই গুরুভার নিজেই বহন করেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বার মাসের ৪ তারিখ থেকে বংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধে ভারতও জড়িয়ে পড়লো; আমার বড় ছেলে এয়ার ফোর্সে থাকাতে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে হোল ও প্ল্যান-মত সব পরিকল্পনা করতে হোল। সে সময় তাদের কথা শুনলে বা চিঠি পড়লে মনে হোত তাদের তরুণ রক্ত দেশপ্রেমের উত্তেজনায় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। দিনে ২১।২২ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও তাদের মনে হোত কম করা হচ্ছে।

আমার চেনা, পরিচিত, সব পুত্রদের জন্যেই চিন্তা হচ্ছিল—একা শুধু আমার পুত্রের কথা চিন্তা হচ্ছিল না। চিন্তা হচ্ছিল সত্যিই, কিন্তু, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে ও শরণে, দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না। মায়ের প্রতি চিঠিতে আমার পুত্রের জন্যে উদ্বেগ ঝরে পড়তো—তখন আমার কি আর চিন্তার দরকার আছে? শ্রীশ্রীমা যেমনি পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিলেন, আবার সেই ভার তিনি নিজেই বহন করলেন—মায়ের চরণে পরম শরণে।

মাতৃত্বের মহাভাবে শ্রীশ্রীমা অধিষ্ঠিতা। সন্তানকে গড়ে তুলতেই শ্রীশ্রীমায়ের প্রচেষ্টা—পরম গুরু! মাতৃগুরু! তোমাকে জানাই আমার প্রণাম!

২৪
অঘটন আজো ঘটে

১৯৭২ এর জানুয়ারী মাসে মা কল্যাণী এসে খরাগ্রামে সবুজ ভাই এর কাছে গেছেন—মায়ের চিঠি পেলাম। সেখানে মাঠে ঘাটে খুব মজা করে, আনন্দ করে, ঘুরে বেড়াচ্ছেন—ছোট্ট মেয়েটির মতন! সেখান থেকে ফিরে এলেন, জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে, মায়ের পরম ভক্ত প্রভাত দত্ত মহাশয়ের গোলপার্কের কাছের বাড়ীতে। বাড়ীর এত কাছে মা এসেছেন—তবুও, আমি সুযোগ-সুবিধা করে খুব বেশীক্ষণ সময় নিয়ে যেতে পারছিনা। কারণ, মায়ের বাবুজী অসুস্থ; তারপর আবার চোখের অপারেশনের জন্যে তৈরী হচ্ছেন। অল্প সময়ের জন্যে যেয়ে মায়ের স্নেহ-আদর নিয়ে আসছি।

সে সময় শুনলাম খরাগ্রামে সবুজ-ভাইএর বাড়ীর পাশের ডাকাতির কথা। আমার মনে হয় সবুজ-ভাইএর বিপদ আসছে জেনেই, মা সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর উপস্থিতি দিয়ে বিপদকে রক্ষা করেছিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ মা কিন্তু এবার এখানে এসেছেনই সবার বিপদহারিণীরূপে। কত বড় বিপদ যে প্রভাতদার বাড়ীতে অপেক্ষা কোরছিলো অজানিতভাবে এবং সেই বিপদ যে মা নিজের অঙ্গের গহনায় সুশোভিত করে ত্রাণ করেছিলেন—তার জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে জাজ্জ্বল্যমানভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ কি এবং তিনি কে!

শ্রীমায়ের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম তাঁকে নিয়ে বেড়াতে যাবার।

শ্রীশ্রীমা সন্তানের বাসনা রাখতে বললেন—"তুমি বেলা ৪টার সময় এসো, গঙ্গার ধারে যাওয়া যাবে।"

মনে আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু, সব আনন্দ বিষাদে পরিণত হোল—যখন বিকাল সাড়ে তিনটায় মাতৃসকাশে পৌছালাম। সন্ধ্যা বললে—'যাও, মাকে দেখে এসো'। মায়ের কাছে যেয়ে দেখি, মা সাংঘাতিকভাবে নিজেকে আহত করে বসে আছেন।

শুনলাম শ্রীশ্রীমা বাথরুমে গিয়েছিলেন—তিনটার সময়; বাথরুমের সারা সিস্টারনটী ভেঙ্গে শ্রীমায়ের ঘাড়ে ও পিঠের উপর প'ড়ে শেষে মেঝেতে পড়ে। আশ্চর্য্য! অত বড় ও অত্যন্তভারী লোহার জিনিসটী মায়ের গা থেকে পিছলে মেঝেতে যেয়ে পড়লেও মেজে থাকে অক্ষত। বাথরুমের ও কোন ক্ষতি হয়নি। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীঅঙ্গে আঘাতের চিহ্ন গভীরভাবে রেখে গেলো।

যা অনেক বেশী হতে পারতো—যেখানে হতে পারতো জীবন-সংশয়—সেখানে, মায়ের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজ তাঁকে রক্ষা করলেন। আর শ্রীশ্রীমা রক্ষা করলেন প্রভাতদার পরিবারের কাউকে—নিজের অঙ্গে আঘাতটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। আবার বলি, মানুষের বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা করা চলে না, তাকে ব্যাখ্যা করবো কি দিয়ে বা কোন সাহসে? শুধু, মাতৃচরণে ভরসা রাখলাম।

প্রভাতদা ও তাঁর স্ত্রী অঝোরে অশ্রু-বিসর্জ্জন কোরছিলেন, তাঁদের কাছে এসে মা এরূপ আঘাত পেলেন বলে। শ্রীশ্রীমা তাঁর দেহের যাতনা ভুলে—অতিস্নেহের, মধুর বচনে সান্ত্বনা দিচ্ছেন দেখলাম।

শ্রীমাকে অতি সাবধানে ও সযত্নে নিয়ে যাওয়া হোল এক্সরে কোরবার জন্যে। ডাক্তাররাও মায়ের সব কথা শুনেছিলেন। কিন্তু, এক্সরে প্লেট দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন! বল্‌লেন—"আশ্চর্য্য! এত বড় চোট্‌ পেয়েও হাড়ে কোথাও ক্ষতের চিহ্ন নেই—শ্রীশ্রীমায়ের এই ক্ষীণ-দেহে তো হাড় টুকরো টুকরো হয়ে যাবার কথা!" জয় মা তোমারি জয়, গাহিছে ভুবন ময়!

গাড়ীতে উঠে, মা বললেন—"চল রেণুকা, গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি; গাড়ী থেকে নাম্‌বো না, গাড়ী আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে যাক।"

আমি জানি, মায়ের দেহে গভীর ক্ষত—তার যাতনা ও কত! তবুও, মা আমার বাসনা পুর্ণ করতে—সব যাতনা দেহাভ্যন্তরে রেখে দিয়ে—খুব বড় শিক্ষা দিলেন আমায়—নিজের দেহ-যাতনাকে সর্ব্বস্ব না করে, দেহ-যাতনা সহ্য করে—অপরকে আনন্দে রাখো!

২৫

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭২—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা। এবার মা কোলকাতায় আছেন—ভাই-বোনেরা সবাই মিলে তিথি-উৎসব পালন করবে, হাজরা রোডে, চিনুদির বাড়ীতে—মা অসুস্থ শরীর নিয়েও সমানে সন্তানদের উৎসাহিত করে তুলছেন! এদিকে প্রভাতদার বাড়ীতে, মায়ের উপস্থিতিতে, ঢালাও প্রসাদের আয়োজন—যে যাচ্ছে, সেই শ্রীমায়ের রাজভোগ-প্রসাদে পরম পরিতৃপ্ত হচ্ছেন—সন্তানদের আদর-যত্ন ও নিষ্ঠায় শ্রীশ্রীমাও অভিভূত। মেয়েকে কাছে পেয়ে উভয়েই আনন্দে অধীর—সর্বতোভাবে মায়ের উপরই নির্ভরশীল! আবার দেখলাম—মা যখন বেনারস ফিরে যাচ্ছিলেন—মেয়েকে বিদেশে যাবার সময় যেমন পিতামাতা মনোমত প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী গুছিয়ে দেন—শ্রীশ্রীমাকে ও ঠিক সেইভাবে তাদের ঈপ্সিত জিনিসগুলি গুছিয়ে দিয়েছেন। তাদের এ মেয়ে কি সাধারণ মেয়ে—"এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।"

শ্রীমাকে নিজের মুখে বলতে শুনলাম—"প্রভাত, তোমরা দুজনে এমন প্রাণ-ঢালা সেবা করলে—আমার অন্তর আনন্দে ভরে গেছে। একেই বলে সেবা।"

শ্রীমাকে আমরা কতটুকুই বা দিতে পারি? যা দেওয়া যায়, তার দশগুণ করেই তো তিনি তা ফিরিয়ে দেন।

শ্রীশ্রীমায়ের তিথি-পূজার আগের দিন ৩রা ফেব্রুয়ারী হোল অধিবাস। মাকে বরণ করা হোল—সেদিন থেকেই চিনুদির বাড়ী হোল উৎসব-মুখর। পরের দিন মায়ের জন্মতিথি-পূজা আরম্ভ হোল। মায়ের চরণে প্রণাম ও অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা হোল ছাদের উপরে। অসম্ভব ভিড় হওয়া সত্ত্বেও ভাই-বোনেদের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় সব কাজই সুশৃঙ্খলার সাথে হয়ে যাচ্ছিল।

শ্রীমা উপরে এসে আসন গ্রহণ করলেন। মাতৃগীতি আরম্ভ হোল; মাতৃ-আরাধনায় মা সমাধিস্থ হয়ে মহাভাবে আচ্ছন্ন হলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আন্তর-রূপের

অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো সমস্ত শ্রীদেহে—জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে! প্রকাশিত হলেন—বংশীধারীরূপে—শ্রীকৃষ্ণ! যুগলরূপে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ! আশিস্‌দায়িনীরূপে—আশীর্ব্বাদিনী শ্রীশ্রীমা!

একে একে সবাই মায়ের চরণে অঞ্জলি প্রণতি জানাচ্ছে। আমি যখন মায়ের শ্রীচরণ পাশে পৌছালাম—দেখলাম, মা জননী যুগল-মূর্ত্তির ভাবের আবেশে রয়েছেন!

শ্রীমায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে, অন্তরে মা মা নাম নিয়ে প্রণতি, অঞ্জলি দেবার পরই উঠে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—শ্রীশ্রীমা মহাভাবে—মহাশক্তি কালীর আবেশে রয়েছেন! শ্রীমায়ের এই ভাব-বিকশিত মূর্ত্তি আমি প্রথম দর্শন কোরলাম। মনে হোল, একি হোল? এই তো মাকে যুগল-মূর্ত্তির আবেশে দেখলাম, প্রণামের পূর্ব্বেই; প্রণাম শেষে দর্শন কোরলাম—বিশ্বজননী মহাশক্তির মহারূপে সংস্থিতা। আমার অন্তর নবঘন আনন্দে পূর্ণ হোল—শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরের পরশ পেয়ে মনে মনে আবার তাকে প্রণাম জানালাম—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ॥"

ছোট বেলায় ১০।১২ বছর থেকেই বুঝি না বুঝি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পড়তাম। তখন পরমহংসের 'দেখা দে মা! দেখা দে!' এই আকুল সুর মনের মধ্যে গভীরভাবে দোলা দিয়েছিল—আজও সেই সুর আমার মনের মধ্যে থেকে মিলিয়ে যায় নি—হারিয়ে যায় নি। বলতে গেলে, সেই সময় থেকেই আমার মাতৃসাধনা—উজ্জ্বল মাতৃমূর্ত্তিরূপে। মা-ময় জীবন—সর্ব্ব অবস্থায় মাতৃদর্শন। তাই, মনে হোল—কৃপা করে শ্রীশ্রীমা আমায় জানিয়ে দিলেন—"আমিই তোর সেই মা—পরমহংস-জননী—শ্রীশ্রীভবতারিণী কালী কাত্যায়ণী।" মাগো! এতদিনের চোখের জল তুমি আমার ব্যর্থ করোনি; তাই, দেখা দিয়েছো চিন্ময়ীরূপে, তোমার আন্তর-কৃপায়!

যখন এরূপ অবস্থা হয়, আমার মন খোঁজে নির্জ্জনতা। তাই, আমি ফিরে এলাম বাড়ীতে, অন্তরে মাকে নিয়ে অতি গোপনে থাকবো বলে।

আবার—দুপুরে ফিরে এলাম মায়ের কাছে—শ্রীদেহের ক্ষতের বেদনা ও যাতনা নিয়েও তিনি রয়েছেন অম্লান—সারাদিনের উৎসবের ক্লান্তি তাঁর মুখে ছিলো না।

শ্রীমায়ের সাথে প্রভাতদার বাসায় ফিরে এলাম। সে'দিনই মা পাঞ্জাব মেইলে বেনারস যাত্রা করবেন। ভিতরের ঘর থেকে মায়ের আহ্বান এলো—"বাইরে কেন, ভেতরে এসো।" ঘরে ঢুকেই বোল্লাম—"মাগো, তোমার চরণে মাথা রেখে প্রণাম করি।" সম্মতি পেয়েই মায়ের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ কোরলাম।

সেদিন মা ব্যস্ত থাকাতে দর্শনের কথা কিছু বলিনি—পরে চিঠিতে জানিয়ে ছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের উত্তর ছিলো—"ঠিকই দর্শন করেছ, তবে সবই তো এক।"

সন্তানদের জন্যে অমৃত ভাবধারা ও অন্তরের আশীর্ব্বাদ রেখে সেবারকার মতন বিদায় নিলেন।

২৬

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীদেহ দিন দিনই বেশ খারাপের দিকে যেতে লাগলো। দিল্লীর সন্তানদের একান্ত কামনায় ডাঃ সন্তোষ সেনকে পরীক্ষার সুযোগ দিলেন।

তবে, মায়ের এক কথা—'আমার কোলকাতার ডাক্তার-ছেলে ছাড়া আর কারো চিকিৎসা নেবোনা।'

শ্রীমায়ের এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতার রূপটি সব সন্তানের শিক্ষণীয় বিষয়—একান্ত নির্ভরতা ও পরম বিশ্বাস।

ডাক্তার-দাদা মাকে জানালেন—"মাগো, কৃপা করো, আমাকে কৃপা করে বুঝতে দাও। আর, দয়া, করে, বেশী সময় নিয়ে, কোলকাতায় এসো। কোলকাতাতে তোমাকে থাকতে হবে।"

শ্রীমাও একান্ত বাধ্য মেয়ের মতন, ছেলের কথা মেনে নিয়ে, কোলকাতায় এলেন জুন মাসে ; চিকিৎসার ব্যাপারে কয়েকদিন হাজরা রোডে চিনুদির বাসায় থাকবেন বলে ঠিক হোল।

ডাক্তার-দাদা আগেই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। যথারীতি পরীক্ষা, নিরীক্ষা, এক্সরে করেও কিছু পাওয়া গেলনা—শুধু শরীরে দুর্ব্বলতা ছাড়া, যা হয়েছে প্রসাদ গ্রহণ করতে না পারবার দরুণ। ডাক্তার-দাদা ঔষধের সুব্যবস্থা করে দিলেন। এমনকি, হ্যারিংটন নার্সিং হোমের ব্যয়-ভার বহন করলেন। প্রতি সপ্তাহে, ডাক্তারকে রিপোর্ট দিতে হবে বলে—শ্রীশ্রীমা চিনু-দিদির বাড়ী থেকে দমদমে সিঁথির আশ্রমে গিয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্রামের খুবই দরকার—ডাক্তারদের মতে। তাই, মায়ের বিশ্রামের ব্যবস্থা হোল। ঠিক করা হোল—বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত মায়ের সাথে সাক্ষাতের সময়।

কিন্তু, আমার পক্ষে এক মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কারণ, বিকালে আমার বাড়ী থেকে আসা খুবই মুস্কিলের ব্যাপার এবং মায়ের বিশ্রামের সম্বন্ধে আমিও একই মত—অন্য সময়ে যেয়ে তাঁকে দর্শন করা চলবে না। সন্তানরা যেমন মায়ের সঙ্গ পেতে উন্মুখ হয়ে থাকে, শ্রীশ্রীমাও তেমনি সন্তানদের কাছে পেলে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—শ্রীদেহের কোন কষ্টই বোধ করেন না।

কি করি ভাবছি—মা কিন্তু, আমার মনের ভাবটুকু জেনে গেলেন।

ইতিমধ্যে, একদিন মায়ের চশমার পাওয়ার বদলবার জন্যে চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ বলাই মিত্রের কাছে গেলেন। তিনি অতি যত্নসহকারে মায়ের পরীক্ষা করলেন। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম তখন বিকাল ৫টা বাজতে অনেক দেরী ছিল। আমার মনে মনে ইচ্ছা ছিল—মাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলে হোত। হঠাৎ, শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা কোরলাম—"মাগো, দক্ষিণেশ্বর যাবে ?" মা কিন্তু, তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলেন।

তখন বেলা ৪টা—মন্দিরের দরজা খুলে গিয়েছে। মন্দিরে বিশেষে ভিড়

ছিলো না। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাজীকে দর্শন ও স্পর্শন করে—মায়ের সাথে শ্রীশ্রীভবতারিণী দেবীর মন্দিরে গেলাম। আমাদের শ্রীশ্রীমা প্রণামের মাধ্যমে নিজেকে ঢেলে দিলেন। বহুক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবার পর উঠে আত্মস্থ হয়ে দেবীমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন—মনে হচ্ছিল, চিন্ময়ী মা আমার আপন মৃন্ময়ীরূপ দেখে আত্মস্থ!

আমাদের হোল কিন্তু পরম লাভ—চিন্ময়ী, মৃন্ময়ী মায়ের মূর্ত্তি এক সাথেই দর্শন হোল। মনে হোল, মায়ের উপস্থিতিতে ভবতারিণী দেবীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হাসিতে ছেয়ে গেছে!

মাগো! তোমার সাথে দর্শনের কি পুণ্য জানিনা—তবে, তোমার সাথে দর্শনের সৌভাগ্যে, মন গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে, অভিভূত হয়!

শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাবটি বড় ভাল লাগে—তাঁর মাঝে সাম্প্রদায়িকতার লেশ-মাত্র নেই—শাক্ত বৈষ্ণবের নাই কোন ভেদাভেদ—নাই কোন জাতের বিচার—নাই কোন বিত্তবান বা বিত্তহীনের পার্থক্য!

একদিন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"মাগো, গাড়ীতে মুসলমান ড্রাইভার থাকলে কোন আপত্তি আছে কিনা?" শ্রীশ্রীমা বললেন—"জান রেণু, মুসলমানদের মধ্যে এমন ভক্ত দেখেছি—যা আমাদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। গ্রামের একটি মুসলমান মেয়ে আমার কাছে এসেছিল—সে খুব জ্ঞানী নয়—তার সাথে আমার ধর্ম্মকথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো—সময়ের খেয়ালই ছিলো না; অতি অপূর্ব্ব মেয়েটি—ভক্তিতে পরিপূর্ণ। ভক্ত, অভক্তের মধ্যেই জাতের বিচার—ভক্তির কাছে কোন জাত নেই।"

শ্রীশ্রীমায়ের কথা নির্ব্বাক হয়ে শুনলাম। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিলো—যা মনের গভীরে যেয়ে মনকে ব্যাপৃত করে রাখে।

সিঁথির আশ্রমে এসে দেখি দূর দূর থেকে মায়ের সন্তানেরা এসে গেছেন দর্শনের আশায়। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বিদায় চাইলাম। অন্তর্যামী মা তখন বললেন—"রেণুকা, বিকালে বোধ হয় তোমার আসবার

সুবিধা হয় না, সকালের দিকে আশ্রমে এসো না কেন? এখন তো অনেক ভাল আছি।" প্রতি সন্তানের আন্তরিক কামনায় মা যে সাড়া দেন—তার যে কোন সন্দেহই নেই।

মাগো! তুমি বলতো কি করে মনের কথাটা বুঝে নাও—বড় জানতে ইচ্ছা করে।

মায়ের আদেশ পেয়ে মাঝে মাঝে সকালে মায়ের বিশ্রামের সময় গিয়ে মায়ের ঘরে বোসতাম—শ্রীমা শুয়ে শুয়ে আমার কথা শুনতেন। আমার মনের আনাচে কানাচে ভাল মন্দ যা ছিল, মায়ের সামনে উজাড় করে নিজেকে মুক্ত করে দিতাম। শ্রীমাও সে সময় কত কথায়, কত উপদেশে, আমার হৃদয় সুধায় ভরে দিয়েছেন—আমার মনের সমস্যাগুলিও খুব সহজ কথায় সমাধান করে দিয়েছেন। মায়ের পূর্ব্বাশ্রমের কথা, দাদামহাশয়ের কথা, পরম পূজনীয় গুরুদেবের কৃপার কথা, এত সুন্দর ভাবে বলতেন যে সেই পরিবেশ মনে চলে যেতো। সেই সরল স্বীকারোক্তি—সত্য কথনের সৎ-সাহস—শ্রীশ্রীমায়ের দাদার নালিশ ছিলো পিতৃদেবের কাছে—"বাবা, খেল্‌তে যেয়ে শোভা তার হাতের নূতন অনন্ত দুটুকরো করে ভেঙ্গে ফেলেছে।" মা এগিয়ে এসে অমনি বললেন—"দুটুকরো নয়, বাবা, তিন টুকরো করেছি।" মায়ের এই সত্য কথার ভঙ্গি দেখে পিতৃদেব শাস্তির বদলে সস্নেহে কোলে তুলে নেন।

আবার বলেছিলেন—"আমার এই অবস্থা হবার আগে অর্থাৎ 'মা' হওয়ার আগে, কেউ আমাকে মা বলে ডাকলে ক্ষেপে যেতাম। আর, মামারা আমাকে ক্ষেপাবার জন্যেই মা-মণি, মা-মণি করতেন। সবার 'মা' হয়ে যাবার পরে একদিন দাদামশাই বললেন—'কই, এখন তো ক্ষেপে যাওনা? বিশ্বশুদ্ধ লোক যে তোমায় মা-মা করছে—এখন কেমন লাগছে?" এই বলে মা একটু মধুর হেসে চুপ করে গেলেন। মায়ের পূর্ব্বাশ্রমের দিদিমা সব জামাইদের মধ্যে মায়ের পিতৃদেবকেই খুব ভালবাসতেন—নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। তাছাড়া, গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি যাবেন বলে—বাড়ীর গাছের ভাল ভাল আম

বেছে, প্রিয় জামাইটির জন্যে রেখে দিতেন—সেই আমে বাড়ীর আর কারো অধিকার ছিলো না—এই কথাগুলি বলে মা উচ্ছসিত হয়ে হাসলেন।

আবার আমার কথা শুনে একদিন বলেছিলেন—"রেণুকা, ধর্ম্মের মাঝে মানুষ ছলনা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কি পায়—কি তার লাভ হয়—আমি বুঝতেই পারি না। ধর্ম্ম মহান্ জিনিস—এরকম সব লোকের জন্যই মানুষের অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে। ধর্ম্মের নাম নিয়ে এসব করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।"

এই সময় শ্রীশ্রীমা আমার মনের একটি সমস্যা খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্বামীর ভগবৎ-বিশ্বাস মনোজগতে যাই থাক, তার বহিঃ-প্রকাশ ছিলো না। তিনি নিজে সব সময় সততা ও ন্যায়ের পথেই চলেন; কিন্তু, বাইরে পূজা-আসনের প্রয়োজন মানেন না। এখানে ছিল আমার সাথে বিরোধ। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ২।১টী বার ছাড়া আনতে পারিনি—অথচ, দূর থেকে মায়ের জন্যে কি ব্যস্তই না হন! অথচ, যেতে বল্লেই বলবেন—"তোমরা যাও, আমি মাকে এখানে বসেই দেখতে পাচ্ছি।" সংসারের শান্তির জন্যে আমাকে আমার স্বামীর কথাই মেনে নিতে হয়—মাঝে মাঝে এই জন্যে মনে আসে অনুযোগ।

এ সব কথা মাকে বলতেই—মা বল্লেন—"বাবুজী বড় সুন্দর—কাজের মধ্যেই তার পরিচয়। তাকে তার মতই থাকতে দাও, জোর কোর না।"

আমার দুর্ভাগ্য! শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত কথা আমি স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে পারিনি। তখন জানতাম না—শ্রীশ্রীমায়ের আন্তর-আদেশ হবে—আমার মায়ের কথা লিখবার জন্যে। আমার লিখিত একটি বই—মায়ের ইচ্ছাতে, পড়তে দিলাম আর অনুরোধ জানালাম আর কাউকে আশ্রমে না পড়তে দিতে। এর পরই মা শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা-উপলক্ষ্যে কল্যাণী চলে গেলেন।

২৭

মাগো! রামকৃষ্ণদার কথায় বলি—যে কথাগুলি গভীর শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়েছিল তার কণ্ঠে, ভাবে ও ভাষায়—"পরব্রহ্ম-রূপিণী, চিদানন্দ-মূর্ত্তি, মা-

জননীকে আমি স্মরণ করি, ভজন করি, পূজা করি, প্রণাম করি। সাক্ষাৎ ভগবানের বিগ্রহ-মূর্ত্তি হয়ে ও আমাদের প্রতি কৃপাবশতঃই মনুষ্যরূপে লীলা করেন—সেই মা জননীকে সাদরে ভজনা করি।"

১৯৭২ সালে জুলাই মাসে শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা-উৎসব মনোরম উৎসবের মধ্য দিয়ে ভক্ত-আনন্দ-মেলায় পরিণত হয়েছিল। ছাদে শ্রীশ্রীপরমদাদাগুরুজী মহারাজ, শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ, শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী ও আমাদের পরম গুরু শ্রীশ্রীশোভামায়ের আলেখ্যচিত্র দিয়ে মনোজ্ঞভাবে মঞ্চ সাজিয়ে—তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে, নেচে নেচে, "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম" নামকীর্ত্তনে মাতোয়ারা সুনীতি—ভাবে বিভোর হয়ে, কীর্ত্তন করে চলেছে—আর তার সাথে যোগ দিয়েছেন অনেকেই—শ্রীশ্রীমায়ের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সারাদিন নামকীর্ত্তন করেও ক্লান্ত হয়ে পড়েননি !

আমি খুব অল্প সময়ের জন্যে উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম—বাড়ীতে শয্যাগত অসুস্থ রোগীর জন্যে। কিন্তু, গুরুপূর্ণিমার দিনও কল্যাণী পৌঁছানো অলৌকিক ব্যাপারের মতই মনে হয়—মনে হয়, শ্রীশ্রীমায়ের কত কৃপা তাঁর এই অধম সন্তানের জন্যে! বাড়ীতে অসুখ, মন ঠিক করতে পারছি না—কল্যাণী যাবো কি না। যখন মন ঠিক করলাম, কালীঘাট রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। আমি সাধারণতঃ কালীঘাট ষ্টেশন হয়ে শেয়ালদা দিয়ে কল্যাণী গিয়ে থাকি। ষ্টেশনে পৌঁছে টিকিট চাইতেই—টিকিটবাবু বল্লেন—"ট্রেন তো এসে গেছে, আপনি কি এই ট্রেনে যেতে পারবেন?" আমি বোললাম—"আপনি তাড়াতাড়ি টিকিট দিন—না পারলে, পরের ট্রেনে যাবো।" এই ট্রেন ধরতে না পারলে শ্রীশ্রীগুরুপায়ে অঞ্জলি দেবার সময় পার হয়ে যাবে—দেখি কি হয়। টিকিট নিয়ে ওভার-ব্রিজ দিয়ে উঠছি, দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। তখনও প্রতি পদে মনে হচ্ছে—এই বুঝি ইলেকট্রিক ট্রেন ছেড়ে দেবে। সিঁড়ির শেষ ধাপে ট্রেনের কাছে পৌঁছলাম—বুকটা ধড়ফড় করছে—দেখি তখনও লাল সিগন্যাল দেওয়া আছে। সামনের

কামরায় উঠে পড়তেই, সেই মুহূর্ত্তে ট্রেন ছেড়ে দিল—আমার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়! মায়ের কৃপা চিন্তা করে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। জয় মা—সকল ভাবনা-চিন্তা তোমার উপর ছেড়ে দিলে, তুমি তোমার সন্তানকে হাতটি ধরে এগিয়ে নিয়ে যাও। কল্যাণী পৌঁছে, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়ে নিজেকে সার্থক কোরলাম! জয় মা!

তারপর, আমার দুজন আত্মীয়কে নিয়ে কল্যাণী যাই মাতৃ-দর্শনের জন্যে। তার মধ্যে একজন মায়ের কল্যাণী-আশ্রমে থাকতে ইচ্ছুক এবং মায়ের কৃপাও তিনি পেয়েছেন। এখানে তাঁর সঙ্গে মা যখন আশ্রম সম্বন্ধে কথা বোলছিলেন, তখন মায়ের একটি কথা আমার বড় ভাল লেগেছিল—"দেখ বিমল! দূর থেকে সব আশ্রমই দেখতে ভাল লাগে। সব আশ্রমেই কিছু না কিছু গলদ আছে। এখানেও আশ্রমের মধ্যে মনোমালিন্য আছে, তবে সংসারী লোকদের মনোমালিন্য টাকা-পয়সা-বিষয় নিয়ে; আর এদের মনোমালিন্য শ্রীশ্রীঠাকুর-জীদের নিয়ে, মাকে নিয়ে—এইটুকু তফাৎ—নিজেদের স্বার্থে নয়। সব মানিয়ে নিয়ে এখানে থাকতে হবে।" শ্রীশ্রীমায়ের মতন এরকম সত্য সরল স্বীকারোক্তি করতে কয়জনের শক্তি, সাহস আছে? সত্য যা, চিরদিনই সত্য তাঁর কাছে। শ্রীশ্রীমা নিজেই সবার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ!

ওরা দুজন নীচে প্রসাদ নিতে গেলে—মায়ের একান্তে যখন বসেছিলাম, মা বললেন—"রেণুকা! তোমার বইখানি পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে। লেখার কথা যদি বলো, তোমার ভাব ও ভাষা জলের মতন স্বচ্ছ—ঝর্ণার মত গতি। তোমার ইচ্ছায় বইটা আর কাউকে পড়তে দিইনি। আমার মুখে শুনে তোমার অন্য ভাই-বোনেরা বলেছেন—'রেণুকাদিকে বলো না, তার মায়ের জন্যে একটা বই লিখতে।' গুরুপূর্ণিমার দিনে ভিড়ে তোমায় বলতে পারিনি।"

শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ আমি মনেপ্রাণে মেনে নিয়ে উত্তর দিলাম—"মাগো, তোমার ভাল লেগেছে—এই আমার পরম পুরস্কার ও আশীর্ব্বাদ—আর কিছু চাই না।"

আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে গেলে, আমি ঠিক মায়ের সাথে মন খুলে ধরতে পারি না, কোথা থেকে আসে সঙ্কোচের বাধা। মায়ের কাছে কিন্তু আমার গোপনীয়তার কিছু নেই—না সংসারের ব্যাপারে, না মনের ব্যাপারে।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে মায়ের শরণ নিয়ে কোলকাতার পথে রওনা হোলাম। কয়েকদিন পরেই মা বেনারস ফিরে গেলেন—দিয়ে গেলেন মায়ের সুগন্ধ সবার মাঝে ছড়িয়ে।

২৮

শ্রীশ্রীমা কল্যাণীতে এলেও মায়ের কাছে বিশেষ যেতে পারি না—সংসারের কত বাধাই না থাকে! মন তাই ছুটে চলে যেতে চায়, মায়ের আশ্রমের শান্ত পরিবেশে—মনে তাই ইচ্ছা হোল, পূজার সময় (১৯৭২) বেনারস যাবো, আগে পরে যখনই হোক।

বাড়ীর সবার শরীর ভাল যাচ্ছিল না বলে, চেঞ্জে যাবার জন্যে, দেওঘরে ঐ সময় বাড়ী নেওয়া হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, আগে বেনারস যেয়ে তারপর দেওঘর যাবো—কিন্তু, অবস্থা-বিপাকে হয়ে উঠলো না। দেওঘরে যেয়ে দেখলাম বাড়ীটা খুব সুন্দর—পূব ও পশ্চিমে দুটো লম্বা-চওড়া বারান্দা—দাঁড়িয়ে অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখা যায়। ভোরের সূর্য্য যখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতো—আলোয় ভরিয়ে দিয়ে প্রকৃতির মন ও প্রাণ—ক্ষুধার্ত্ত মন সুধায় ভরে দিয়ে—তখন মনে হোত, শ্রীশ্রীমায়ের উজ্জ্বল হাসিটি যেন আলোর সাথে ছড়িয়ে পড়তো এই সুরটি নিয়ে—'আমি এসেছিরে, এসেছি তোদের দ্বারে, বন্ধ দুয়ার খুলে দেরে আপন অন্তরে! চিরকাল মোর আসা-যাওয়া—বিরাম-বিহীন চাওয়া-পাওয়া—আলোর মাঝে মাতৃস্নেহের করুণাধারা আমিই ঢালিব রে!'

সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে তাকালে মনে হোত—আলোর রেখায় ও নিপুণ শিল্পীর চিত্রাঙ্কনের রঙ-এর সমাবেশে—শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ প্রকাশ!

এই সুন্দর পরিবেশে এসে, বার বার মনে হচ্ছিল মায়ের কথা। বাড়ীর পিছনে সুবিস্তৃত ফসলের ও আম-বাগানের শ্যামল শোভা—মা এখানে এলে মায়ের খুবই ভাল লাগতো! এই শান্ত পরিবেশে মন সর্ব্বদাই মায়ের মাঝেই ঘোরাফেরা করতো।

রক্ষাকর্ত্রী মা

একদিন সকালে—বেলা দশটা হবে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মন কখন মগ্ন হয়ে গেছে মায়ের ভাবেতে—কিছুরই খেয়াল ছিলো না। আমার পিছনেই রোদে দু বালতি জল রাখা ছিল। মনের ঐ ভাব নিয়ে, যেই আমি ঘরে ফিরবার জন্যে পা বাড়ালাম—বালতি পেরিয়ে পড়ে গেলাম ছিটকে। পড়লাম বেশ দূরে। মাথাটা থামের সাথে লাগলো। বাড়ীর অন্য অংশে যারা ছিলেন ও আমার বাড়ীর লোকেরা দৌড়ে এল—সবাই ভাবলে, নিশ্চয়ই আমার কোথাও না কোথাও হাড় ভেঙ্গে গেছে। তখন আমি উঠে বসে হাসছি। অত জোরে পড়ে, আমার যে মাথা ফাটেনি বা কোন আঘাত লাগেনি—কেউ বিশ্বাস করতেও চাইছিলেন না—এমন কি, আমার নিজেরও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। মায়ের বাবুজী তো আমাকে বকাবকি করতে লাগলেন—"সব সময়ই এত অন্যমনস্ক থাকো—কি ভাব নিয়ে থাকো—তুমিই জানো!" আমি শুধু আস্তে বোললাম—"যাঁর ভাব নিয়ে ছিলাম, তিনিই আজ আমায় রক্ষা করেছেন—বুঝতে পারছো না?"

আমাদের পাশের অংশে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি খুব ভক্ত মানুষ। তিনি বললেন—"খুবই আশ্চর্য্য! আপনি কি করে বেঁচে গেলেন, বুঝতে পারছি না!" তাকে বোল্লাম—"শ্রীশ্রীশোভামায়ের চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলাম—মনের ভাবনার মাঝে জড়িয়ে তাঁর দর্শন পাচ্ছিলাম—তিনিই আমাকে আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে না?" তিনি আমার কথা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন।

এর পরেও আমি দেহে কোন বেদনা বোধ করিনি। এর কারণ আমি দর্শাতে চাই না—আমার যা পরম বিশ্বাস আমার অন্তরেই থাক!

২৯

শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিতে আহ্বান এলো—"বাবুজীকে নিয়ে, দেওঘর থেকে তোমরা সবাই একবার টুক্ করে চলে এসো।"

এর পর মায়ের কাছে যাবার অদম্য ইচ্ছা জাগতে লাগলো—টাইম টেবিলের পাতা উল্টে, যদিও বেনারস যাবার ট্রেন সময় মত পাই—কিন্তু, দেওঘরে ফিরবার ট্রেন গভীর রাত্রে—একলা ফিরবার সুবিধা নেই। কারণ, সংসার এখান থেকে ওঠাবার সময় আমার দেওঘরে উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। মনের দুঃখে, মায়ের উদ্দেশ্যে একটা কবিতা লিখে ফেললাম—(মাগো! তোমার কাছে যাবো বলে, করেছিলাম আশ। তাই তো আমি মনে মনে বেনারস কোরছিলাম বাস॥ টাইম টেবিলের পাতা ঘেঁটে, পেলাম নাকো খুঁজে পেতে, সময়মত ট্রেনের টাইমগুলি; সবই আছে গভীর রেতে, তাই তো মনের ইচ্ছা মনেই রাখি তুলি।)

সবাই আমার উপর বিরক্ত হোল; শুনতে হোল, আমি নাকি বেনারস যাবার জন্যেই দেওঘর এসেছি।

যাই হোক্, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাতে আমার যাবার সুযোগ হয়ে গেলো—হঠাৎ, আমার ছোটবৌমার ভাই আসাতে। ওদের নিয়ে ৪ঠা নভেম্বর কোলকাতা ফিরে যাবার বন্দোবস্ত হোল। যশিডি থেকে ওদের ট্রেন ছেড়ে গেলো—আমি বম্বে-জনতাতে মোগলসরাই যাবো বলে, ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। গাড়ী দু'ঘণ্টা লেট্। আমার কোন রিজারভেশন ছিল না। ট্রেন যখন এলো, দেখলাম—গাড়ীর কোন কামরাতে আলো নেই—অন্ধকার। কিন্তু, অবাক কাণ্ড! আমার সামনে এসে যে কামরাটা থামলো, তাতে দেখলাম আলো জলছে। মায়ের নির্দ্দেশ মনে করে, আমি বিনা দ্বিধায়, সেই কামরাতে উঠে

দেখি বোসবার যথেষ্ট জায়গা আছে। কিছুক্ষণ বাদেই ট্রেন ঝাঁঝা ষ্টেশন পেরিয়ে গেলে, পেলাম শোবারও জায়গা। কিন্তু, আস্তে আস্তে আমাদের গাড়ীর কামরার বাতিও নিভে গেল—সারা গাড়ী অন্ধকার—আমি একলা মহিলা রয়েছি গাড়ীতে। কিন্তু, আমার মনে এতটুকু ভয় ছিল না—জানতাম শ্রীমা যে আমার সাথেই রয়েছেন। একটা জিনিস আমার সব সময় বোধ হয়—কোন সময়েই আমি একা নই। নির্বিঘ্নে মোগলসরাই এসে নামলাম। কুলির পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে এলাম, বেনারসের জন্যে ট্যাক্সি ধরব বলে। এখানেও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা—একটি মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে; সব ভর্ত্তি—শুধু পেছনের একটি সীট খালি মনে হোল, যেন আমারই জন্যে; তাও তিনজন যারা পেছনের সীটে রয়েছেন—সবাই মহিলা। তারা কানপুর থেকে আসছিলেন—গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়ের কথা বলছিলেন। আমি বললাম, আমি তো বম্বে জনতাতে যশিডি থেকে এলাম, গাড়ীতে একটুও ভিড় ছিল না। হঠাৎ, সামনের সীট থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"কি বলছেন, গাড়ীতে তো খুব ভিড় ছিল—আমি ঐ গাড়ীতেই এসেছি।" আমি তো শুনেই অবাক! মনে মনে, মায়ের চরণে প্রণাম জানালাম—তোমার ইচ্ছায় সবই সম্ভব মা!

সকাল সাতটার আগেই আশ্রমে এসে পৌছালাম। কিন্তু, দূর থেকে আশ্রমের পরিবেশ—মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ থেকে মনে হচ্ছিল—শ্রীমা আশ্রমে নেই নাকি! কয়েকদিন আগেই তো মায়ের চিঠি পেয়েছি, কোথাও যাবার কথা তো লেখেন নি। ব্রহ্মধামে স্তোত্র-পাঠ হচ্ছিল—আমাকে দেখেই দিদিভাই বেরিয়ে এসে বললেন—"মা নেই, নৈমিষারণ্য গেছেন। মঙ্গলবার সকালেই ফিরে আসবেন বলে গেছেন। তুমি এসো, স্নান করে প্রসাদ পাবে।" সেদিন ছিল রবিবার—দুদিন পুরো বাকী—শ্রীশ্রীমায়ের আসতে!

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এত আগ্রহ নিয়ে ছুটে এলাম—এসেই মায়ের দর্শন পেলাম না, মনটা ব্যথা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ভাব কেটে গেল—

জয় মা বলে প্রণাম জানালাম। মন্দিরে প্রণাম করে—দিদিভাই ও কণামণিকে প্রণাম করলাম। শুনলাম, দিদিমা আশ্রমে উপস্থিত আছেন। আমি বললাম—"যাক্, ঘরে মা নেই, তোমরা আর দি'মা তো আছেন!"

পরদিন ছিল দেওয়ালী। বহুদিনের বাসনা ছিল শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার অন্নকোট দেখবার। দিদিভাই, দিদিমনিকে সেই ইচ্ছা জানাতে—সুনীতিদির মেয়ে সতীর সাথে খুব ভোরে যাবার বন্দোবস্ত হোল। অত ভিড়ে আমরা যাব—সবাই চিন্তিত। আমাদের দুষ্টু রবিভাই ও রানুভাই বললে—যাওনা, ভিড় দেখে ফিরে আসবে। পরম পূজনীয়া দি'মা উৎসাহ দিলেন।

আমি কোনদিনও অন্নকোট দর্শন করিনি। সতী আর আমি শ্রীশ্রীমায়ের নাম নিয়ে, খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক করলাম, আগে অন্নকোট দর্শন করে, তার পর গঙ্গাস্নান করবো। সতীই ছিল আমাদের পথ-প্রদর্শক—গঙ্গাজল চেয়ে নিয়ে নিজেদের মাথায় ও দেহে ছড়িয়ে নিলাম। জায়গা মতন পৌঁছে দেখলাম—মন্দিরের পাশে ঢুকবার জায়গায় বেশ লাইন—বড় লাইন হয়েছে—ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকেরা সুষ্ঠুভাবে সব পরিচালনা করছেন।

কিন্তু মায়ের কৃপাতে ৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের ঢুকবার টার্ন এসে গেল—সারাপথ আমি অন্তরের প্রেরণায় জোরে জোরে—"শ্রীশ্রীমাতাজীকী জয়" দিতে লাগলাম! আমার সাথে সাথে সবাই মেতে যেয়ে মায়ের জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। (আগে এসব ব্যাপারে খুবই লজ্জা ছিলো; কিন্তু, শ্রীশ্রীমা দয়া করে সব লজ্জা ভেঙ্গে দিয়েছেন।) সারা মন্দির-প্রাঙ্গণ মায়ের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হোল। শ্রীমায়ের জয় দিতে দিতে—সোনার অন্নপূর্ণা, মিঠাই-মণ্ডার মন্দির, মন্দিরাকারে অন্নের ভোগ, বহুপ্রকারের ব্যাঞ্জন ও মিঠাই, নোনতা খাবারের ভোগ—অতি সহজেই সব দর্শন-স্পর্শন করে—বাবা বিশ্বনাথজীর মন্দিরে উপস্থিত হলাম। খুব ভিড় ছিল; কিন্তু, আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তের জন্যে বিগ্রহের কাছে ভিড় সরে যাওয়াতে, শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ দেবকে আমরা ভালভাবে

স্পর্শ করতে পেরেছিলাম। মনে হচ্ছিল, শ্রীমা যেন আমাদের সাথেই ছিলেন, না হলে এত ভিড়ে, এত অনায়াসেই, দর্শন কি করে হতে পারে ?

দর্শন-শেষে আমরা গঙ্গাতীরে গেলাম স্নানের মানসে। এই পুণ্য, পবিত্র দিনে, নানা দেশ-বিদেশ থেকে, নানা জাতীয় লোক, নানা ধরনের ও নানা বর্ণের পোষাক পরে, শ্রীশ্রীগঙ্গাজীর পূজা দিতে এসেছেন। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যে গঙ্গার প্রতিটি ঘাটকে কে যেন নানা রঙএর শোভায় চিত্রিত করে রেখেছেন। এই বর্ণের সমারোহের ভিড় সত্যিই দেখবার মতন—উপভোগ করবার মতন।

ভিড়ের মাঝে ফাঁকা দেখে, শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে আমরা দুজন পরিতৃপ্তি-সহকারে স্নান করে আশ্রমে ফিরে এলাম।

বহুদিনের মনের বাসনা—অন্নপূর্ণার মন্দিরে অন্নকোট দেখবো। আর এবার ইচ্ছা হয়েছিল—ষ্টেশন থেকে সোজা গঙ্গাস্নান করে মায়ের কাছে যাবো। মায়ের ইচ্ছাতে দুটোই পূর্ণ হোল। একটা কথা ঠিকই, শ্রীশ্রীমা আশ্রমে উপস্থিত থাকলে, আর কোথায়ও যেতে মন চায় না।

মাগো ! তুমি যে আমাদের জীবনে প্রতিটি কাজের মাঝেই রয়েছ, তার জলন্ত নির্দ্দেশ, তোমার সন্তানেরা কতভাবেই পেয়েছে ও পাচ্ছে—তবুও তোমার অদর্শনে আমরা কাতর হয়ে পড়ি—অসহায় হয়ে পড়ি। জীবনের প্রতিটি চলার পথেই যে তুমি হাত ধরে রয়েছ—সেই বিশ্বাসের বোধ হোল কই !

সেদিন দেওয়ালী-উপলক্ষ্যে ব্রজধামে মায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও ভোগ-আরতির ব্যবস্থা ছিল। ব্রজধামের নাট-মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখি—খুব মনোরম ভাবে ফুল দিয়ে সাজিয়ে—মন্দিরাকারে অন্নভোগ—নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টি—ঠাকুরজীদের সামনে স্থাপিত হয়েছে। সেদিন আরতি করলেন—পরম পূজনীয়া দিদিমা। শ্রদ্ধেয়া দিদিমার আরতি দর্শন করে মন পুলকিত হয়ে উঠছিল—ভাবের ব্যঞ্জনায়, দি'মার মুখের মাঝে ফুটে উঠেছিল—আরতির মাঝে আত্মসমর্পণের অপরূপ রূপটি !

বিশ্বমাতা-জননী তুমি—তোমাকে জানাই আমার অন্তরের অনন্ত প্রণাম!

ভোগের শেষে, আমরা সবাই অমৃত প্রসাদ পেলাম। শ্রীশ্রীমা আশ্রমে নেই ; কিন্তু, ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই। তবুও, মায়ের অদর্শনে আকুল মন মাঝে মাঝেই ফাঁকা লাগছিল। বার বার শ্রীমাকে মনে মনে বলছিলাম—'মাগো', কাল ভোরেই তুমি ফিরে এসো! অনন্ত সময়ের মধ্যে আমার সময় যে কম—কলকাতা ফিরতে হবে।' শ্রীমা কাল ভোরেই আসবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে শুতে গেলাম।

শ্রীশ্রীমা বোধ হয় মেয়ের প্রার্থনা শুনতে পেয়েছিলেন। তখন ভোর সাড়ে ছয়টা হবে—শ্রীশ্রীমা নিঃশব্দে ব্রজধামে এসে উপস্থিত। তখন সেখানে স্তোত্র-পাঠ হচ্ছিল—মনে হোল, হঠাৎ মায়ের আবির্ভাব হোল! সবাই মা মা করে ছুটে এসে প্রণাম করে চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো—মনে হচ্ছিল সবাই যেন বহুদিনের পরে মায়ের দর্শন পেয়েছেন!

আমাকে দেখে মা বললেন—"তুমি এসেছ! আমাকে এসে পেলেনা তো—কি রকম সারপ্রাইজ দিলাম বলতো!"

অনেকক্ষণ পরে মাকে পেলে—ছোট শিশুরা যেমন অভিমানে ঠোঁট ফুলায়—আমার মনের অবস্থা তখন সেই রকমই হয়েছিল। আমি উত্তর দিলাম—"কেন মা-মণি! আমিও যে তোমাকে সারপ্রাইজ দিলাম।"

মা-মণি হেসে বললেন—"তাও সত্যি—তবে, আমি তোমাকে আশা করেছিলাম।"

মাগো! আমি তো জানি তোমার অজানা কিছুই থাকে না, শুধু তোমার লুকোচুরির খেলায় আমরা হয়ে পড়ি বিভ্রান্ত। কানামাছি করে, চোখ বেঁধে, দূরে সরে যেও না মা। তাহলে তো, সারাজীবনই হাতড়ে হাতড়ে, খুঁজে মরতে হবে, কোথায় পাবো আলোর পরশ? খেলা ছেড়ে, চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে, কোলে টেনে নিও মা, তোমার অযোগ্য সন্তানদের যোগ্য করে!

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমরা সবাই তাঁর শ্রীমুখে নৈমিষারণ্যের ও চিত্রকূটের

ভ্রমণ-কাহিনী শুনলাম। মা বলছিলেন—"চিত্রকূট যাবার জন্যে করভী ষ্টেশনে নামতে হোল। তার পর দিন ভোরে চিত্রকূট যাবার জন্যে রওয়ানা হয়ে প্রতিপদে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—আমারও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। বললাম—থাক্, আর চিত্রকূট দেখতে হবে না—গঙ্গায় স্নান করে সবাই ফিরে চল। আমার কৃষ্ণজীর রাজত্বই ভাল, রামজীর রাজত্ব ভাল নয়। এই কথা জোরের সাথে বলার সঙ্গে সঙ্গে, মনে হোল, রামজীর কানে গেল। তারপর সত্যিই আর কোন অসুবিধা হয় না—রামজীই যেন রথী হয়ে আমাদের রথ চালিয়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি অতি সহজেই দেখিয়ে দিলেন।"

আমি তো মায়ের মত অপূর্ব্ব করে বলতে পারছি না—মায়ের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব লেগেছিল কথা কয়েকটি।

জোরের মতন জোর করতে পারলে, ভগবানও তাঁর একটি বিচ্যুতি শুধরে নেন—এ জোর তো দেহের জোর নয়, মনের অনুরাগের জোর!

শ্রীরামের পরে গভীর অনুরাগে অভিমান করেই বলেছিলেন মা কথাগুলি—শ্রীরাম তখন 'তথাস্তু' করে নিজের ভুল শুধরে নিয়েছিলেন।

তুমিই জানো মাগো, আমার এ কথা ঠিক কি ভুল—তুমিই এর উত্তর দিয়ে দিও—কেমন মাগো?

প্রভাতী প্রসাদ শেষ হয়ে যাবার পরে—শ্রীশ্রীমায়ের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে—মায়ের মুখের কথা শুনে মন আনন্দে পূর্ণ হত—মাঝে মাঝে মায়ের শ্রীচরণে হাত বুলিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করতাম।

একদিন মায়ের মুখে শুনলাম—শেষরাতে কাক কেন—কা-কা করে ডাকে। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য অন্ধকারকে নাশ করে আলোতে নিয়ে আসেন। তাই কাকেরা—কা-কা করে জানিয়ে দেয়—হে জ্যোতির্ম্ময়! আমাদের রং কালো। শ্রীশ্রীমায়ের মুখ নিঃসৃত এই গল্পটি শুনে এত ভাল লেগেছিল যে—আমার প্রিয়জনদের কাছে এই গল্প আমি করেছি।

শ্রীশ্রীমায়ের মতন মধুর করে কি আমি বলতে পারি? তাঁর মুখে

সবই লাগে যে অপূর্ব্ব মধুর! তুমি মধু, তুমি মধু—মাগো, তোমার সকলই মধুময়!

৩০

শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে, গোপাল-গোপালীদের জন্যে—সন্ত-শিশু-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে—মায়ের একান্ত ইচ্ছায়। আমার আশ্রমিকা বোনেরা এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে থাকেন—শ্রীমায়ের মাধ্যমে। শিশুদের প্রতি তাদের সজাগ দৃষ্টি, স্নেহ-মমতা, শিক্ষার ভাবধারা—আমার মনে হয়, প্রতিটি শিশু-বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ। স্কুল উদ্বোধন হয়েছে অল্প দিনই—খুব অল্প সময়ে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। মাঝে মাঝেই বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার আমোদ ও আবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে, বাচ্চাদের সাথে বসে ম্যাজিক শো দেখলাম; তারপর শুনলাম ওদের ইংরাজী ও হিন্দী আবৃত্তি, নাচ ও গান। সব ব্যবস্থাপনার মাঝেই শ্রীশ্রীমা রয়েছেন মধ্যমণি হয়ে। সব মায়ের নয়নের মণি—আদরের দুলাল, দুলালী—গোপাল, গোপালী।

মাগো! তোমার ছোট্ট শ্রীদেহে তুমি কত শক্তিই ধর—ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়!

এই সময়ে দিল্লী থেকে মঙ্গলাদি শ্রীশ্রীমাকে সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যযুক্ত অপূর্ব্ব মীরাবাঈ-এর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি পাঠালেন। মা তো মীরাবাঈকে দেখে মহাখুশী—তখন মনে হচ্ছিল ছোট শিশু আর মাতে কোনই তফাৎ নেই! সারাদিন মীরাবাঈকে নিয়ে মহা-উৎসাহে মেতে রইলেন—কত ভাবে, কত স্নেহের দৃষ্টিতে, ভক্ত মীরাবাঈকে দেখছিলেন। মনে হচ্ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর চরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা মীরাবাঈ-এর সাথে মায়ের যুগযুগান্তের পরিচয়। ভক্ত মীরাবাঈ-এর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির মাঝে জীবন্ত মীরাবাঈকে দর্শন করছিলেন আমাদের শ্রীশ্রীমা।

৩১
কল্যাণময়ী মা

এর মধ্যে একটি দিনের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের মহানুভবতা ও উদারতার কথা—না বললে অনেকখানিই বাদ থেকে যাবে।

আমার এক আত্মীয়া—শ্রীমতী তুষার দাশগুপ্তা—সে সাঁইবাবার খুব ভক্ত। তাঁর কৃপাতে, বিভূতির সাথে, রূপার লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিবলিঙ্গ, ডমরু সাপ ইত্যাদি এসেছিল। মেয়েটি ভক্তিমতী—শ্রীশ্রীশোভামাকেও ভালবাসে। তাই, উৎসাহের সঙ্গে সব মূর্ত্তি নিয়ে এসেছিল—শ্রীমাকে দেখাবার জন্যে। শ্রীমা গভীর আগ্রহ নিয়ে সব দেখলেন ও সবাইকে ডেকে দেখিয়ে, প্রণাম করতে বললেন। আমার মায়ের কি মহান্ রূপ! অসীম শক্তির অধিকারিণী বলেই, শ্রীশ্রীমা সবাইকেই বড় করে দেখেন। তাঁর কাছে নেই কোন ভেদাভেদ—আমরা ছোট মনের গণ্ডীতে আবদ্ধ বলে, হিংসা-দ্বেষে মনকে সংশয়ে আচ্ছন্ন করে রাখি।

তুষার চলে যেতেই, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"মা, এও কি সম্ভব হয়?" শ্রীশ্রীমা, আমার কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন—

"রেণুকা, মনে কোন অবিশ্বাস রাখবে না—তাঁর কৃপাতে সবই সম্ভব। কি সম্ভব আর কি সম্ভব নয়—সেটা বিচার করতে যাওয়া মূর্খতা। তাঁর কৃপা হলে, সব অসম্ভবই সম্ভব হতে পারে।"

শ্রীশ্রীমা ছোট একটু স্নেহের তিরস্কারে—আমায় অখণ্ড বিশ্বাসের অনু-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করলেন।

শ্রীশ্রীমা বলেন—"যেখানে যখন যাবে, সেখান থেকে ভালটুকুই আহরণ করে আনবে। কারো কাছ থেকে কোন কথায়, ব্যবহারে—তোমার মায়ের সম্বন্ধেও—মনে ব্যথা পেলে, নীরব থাকবে—কারো কাছে প্রকাশ করবে না; এমন কি, আমার কাছেও না! সে কথাটা মনে না রেখে—মন থেকে দূর করে দিতে চেষ্টা করবে। অভিমানে আত্মা ক্ষুব্ধ হয়।"

শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি প্রতি সাধু-সন্তদের কথা তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এমন কি, দেখেছি—ওঁর সন্তানদের, আশ্রম থেকে ভাল ভাল জায়গায় যেতে, নিজেও উদ্বুদ্ধ করেন ও উৎসাহ দেন।

মাগো! তোমার প্রতিটি সন্তানের চিত্তের বৃত্ত প্রসারিত করে, নির্ম্মল ভাবধারার অমৃতের মাঝে, আনন্দের মাঝে নিয়ে যেতে—তোমার প্রতি-মূহূর্ত্তের প্রচেষ্টা! তোমার মহানুভবতা ও উদারতার ভাবটুকু দিয়ে আমাদেরও পূর্ণ করে নাও, জননী!

সোমবার আমার কোলকাতা ফিরে আসবার দিন শ্রীমা স্থির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যে রিজারভেশন পাওয়া যায় নি। রবিবার রাতেও মনে হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের সমাধি ভঙ্গ না হলে, এ অবস্থায় মাকে ফেলে, কিছুতেই কোলকাতা যাব না—তার জন্যে, ফিরতে ২।৩ দিন দেরী হলেও ক্ষতি নেই।

সোমবার মঙ্গলারতির পর মা নিজেই আমাকে কোলকাতা রওনা হবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

যে গভীর আবেগ ও আনন্দ নিয়ে বেনারস-আশ্রমে ফিরে যাই—ফিরবার পথে, মন যেন আর চলতে চায় না! জানি তো, মা সর্ব্বক্ষণের সাথী; তবুও, দৈহিক জগতে মাকে ছেড়ে ও আশ্রম ছেড়ে আসতে বুকের ভেতর টন্ টন্ করে, ব্যথা করে। কিন্তু সংসারের কর্ত্তব্য—ফিরতে তো হবেই। শ্রীমা কবে একান্ত করে, আপনার কাছে টেনে নেবেন, তাই ভাবি। এ জনমে আমার দীনহীন জীবনে, মায়ের কাছ থেকে যে কৃপা পেয়েছি—তাই আমি পরম আশীর্ব্বাদরূপে মস্তকে ধারণ করে নিয়েছি।

রিজারভেশন ছিলো না বলে—মা তাঁর সুযোগ্য সন্তান রামকৃষ্ণদাকে ভার দিলেন আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে—গাড়ীতে তুলে দিতে।

ষ্টেশনে যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমায়ের বরাভয়দায়িনী, শুভঙ্করী, সন্তান-স্নেহে উদ্বেলিতা, অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করে—তাঁর চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিলাম।

চোখে জল—মুখে ও মনে-প্রাণে—মা-মা আহ্বান! সাইকেল-রিক্সা রওনা হোল। যতদূর দৃষ্টিপথে পড়ে—দেখলাম, মা তাঁর অভয়-হস্তটি সঞ্চালন করে যাত্রা-পথের বিঘ্ন-বিপদ দূর করে দিচ্ছেন!

শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলময়ী শ্রীমূর্তি দর্শন করলে—মন স্তব্ধ হয়ে, বাক্যহীন হয়ে যায়!

বেনারস ষ্টেশনে পৌঁছালাম যখন, তখন ও গাড়ী আসতে কিছু বিলম্ব ছিল। দুই ভাই-বোন আমরা—সে সময়টুকু মায়ের কথা দিয়েই ভরিয়ে রেখেছিলাম। শ্রীযুক্ত রামদার অসীম মাতৃভক্তি। তদ্‌গত চিত্তে যখন মায়ের কথা বলেন—তার সারা চোখ-মুখ ও দেহের ভাব হয়ে যায় মা-ময়! তার মায়ের কথা বলার ভাবটুকু ছিলো—মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় ও অমৃতে ভরা!

গাড়ী এসে গেলো—পাঞ্জাব মেইল। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে ও রামদার চেষ্টাতে লেডীসে আমি লোয়ার বার্থ পেয়ে গেলাম। মাতৃ-আজ্ঞা রামদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। গাড়ী ছেড়ে দিলো—রামদাকে ষ্টেশনে রেখে, গাড়ী এগিয়ে চল্‌লো। মনে মনে মায়ের জয়ধ্বনি দিলাম। মায়ের জয়ধ্বনি দিতে কোন চেষ্টা করতে হয় না—স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই, মন মায়ের জয় গেয়ে ওঠে!

গাড়ী একটুও লেট ছিলো না। একা আসছি বলে মায়ের খুব চিন্তা ছিল। বাড়ীতে খবর দেওয়া ছিল না। কিন্তু, একথার পর একটা সুবন্দোবস্ত শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। সাধারণতঃ, হাওড়া ষ্টেশনে লাইনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি নিতে হয়। আমি ভাবছি, ট্যাক্সির জন্যে লাইন দিতে হবে। ওমা! গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসতেই, একটি লোক জিজ্ঞাসা করলো—"মাইজী তুমি কোথায় যাবে?" নিউ আলিপুর যাবো শুনে, বল্‌লে—"আমার ট্যাক্সি আছে—তুমি এসো।" ট্যাক্সিওয়ালার সৌম্য চেহারা দেখে ট্যাক্সিতে যেয়ে বোসলাম।

এর পর ও কি সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকতে পারে—মা ছাড়া আর কে তার সন্তানের পথের সুবন্দোবস্ত করে রেখেছে?

মাগো! তোমার কৃপার অন্ত নেই! শুধু, প্রাপ্তিযোগের মধ্যেই যেন তোমার কৃপাকণা দেখতে না পাই—অপ্রাপ্তির মাঝে ও যেন তোমার অপার-করুণা ও কৃপাকণা দেখতে পাই—সেই আশীর্ব্বাদই ক'রো।

আমরা সংসারী; মন মোদের বড়ই দুর্ব্বল—অন্তঃকরণের পরিসর বড়ই ছোট। আঘাত ও বেদনা পেলেই—মনোবাঞ্ছাপূর্ণ না হলেই—মনে জেগে ওঠে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অভিমান। তুমি আমাদের সেই দুর্ব্বলতা থেকে রক্ষা করতে শক্তি দাও মা—শক্তি দাও! তোমার চরণে পরম শরণে, সব দুর্ব্বলতা কাটিয়ে যেন উঠতে পারি—সেই আশীর্ব্বাদই করো আমাদের!

৩২

১৯৭৩ এর জানুয়ারী মাস—

শ্রীশ্রীমা কল্যাণীতে এসেই সবুজ-ভাইএর কাছে চলে যাবেন। শ্রীমা কল্যাণীতে এসে পৌছাবার পরদিনই—ক্যানাডা থেকে নবাগত পুত্রবধুকে নিয়ে, মায়ের চরণ-দর্শনে কল্যাণীতে গেলাম। সঙ্গে ছিলো আমার বড়ছেলের দুটী ছোট ছেলে, মায়ের বাবুজী, গৌতম ও জয়ন্ত। পুরো সংসার নিয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হোলাম—গৃহকর্ত্রীরূপে। শ্রীমা তাইতো বলেন—রেণুকা যখন একা আসে, তখন ছোট্ট মেয়ের মতন মনে হয়। শ্রীমায়ের কাছে বসে আছি—হঠাৎ, আমার ছোট নাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করছে—"ঠাম্মা! তোমার মা কি ভগবান?" মাত্র ৪ বছর তার বয়েস—কেন সে একথা ভাবলে—জিজ্ঞাসা করতে বল্লে—"দেখতে যে ভগবানের মতন লাগছে!" আমি তাকে আদর করে বোললাম—'তোমার কথাই ঠিক; আমার মা ভগবান।' ওরও স্থির বিশ্বাস হয়ে গেলো। মাগো! তোমার মধ্যে সে কি দেখেছিল বা তুমি তাকে কি দেখিয়েছিলে জানিনা; তবে সে এলেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতো—তোমার গল্প আমাকে করতে হোত; না হলে, অস্থির করে তুলতো। ছোট মনে তো ভগবানের বাস—তাই না মা? তবে, তারা-যে কথা বলে,

সেটাও তো ভগবানের দান—তাই না মা ? তবে, আমার নাতির কথাই ঠিক —'তুমি ভগবান'—তোমার চরণে প্রণাম।

মনে কত আশা ছিল—মা সবুজ-ভাইএর কাছ থেকে ফিরে এলে, কল্যাণীতে কয়েকদিন আনন্দের মাঝে, মাতৃ-আনন্দমেলায় কাটিয়ে আসবো। কিন্তু, ভাগ্য বিরূপ! নানা বাধা-বিপত্তির মাঝে, যেতে সময়ই পেলাম না! তবুও, মনে করি, শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ইঙ্গিত নিশ্চয়ই কিছু ছিলো—যার জন্যে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারিনি। কিন্তু, তার জন্যে আমার স্নেহময়ী মাকে বার বার আমার চিন্তা-ভাবনার মাঝে আসতে হয়েছে—আমার অন্তরে। আনন্দ, অভিমান ও অশ্রুর মাঝেই মাকে পেয়েছি—অন্তরঙ্গভাবে, অনন্ত-রূপে!

শ্রীশ্রী১০৮ রামদাস কাঠিয়া-বাবাজী মহারাজের তিরোধান-উৎসবের শেষে শ্রীমা ২১শে জানুয়ারী বেনারস যাবার জন্যে হাওড়া ষ্টেশনে এলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর মেয়েটিকে ষ্টেশনে যাবার সুযোগ করে দিলেন। ষ্টেশনে যেয়ে দেখি—বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছে—অসম্ভব ভিড়। অনেক কষ্টে পথ করে, মায়ের সামনে প্রণতি জানালাম। এতদিনের মাকে না পাবার মনোকষ্ট—মায়ের পানে চেয়ে—সব দূর হয়ে গেলো। শ্রীশ্রীমা কিন্তু, আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন—অন্তর্যামী মায়ের কিছুই তো অজানা থাকে না—এত ভিড়ের মধ্যেও সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে আমার আপদ-বিপদের কথা জেনে নিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে, আমরা মায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে মাতৃস্পর্শ-আশীষ-স্নাত করে নিলাম নিজেদের। ট্রেন ছাড়বার সঙ্কেত পাওয়া যেতে—একটু এগিয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে চলমান ট্রেন্ থেকে মা হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমার হাত এগিয়ে দিতেই—শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শ পেলাম! সে স্পর্শের উত্তাপে সারা দেহে আমার অপার্থিব শক্তির সঞ্চার হোল। মনে হোল, শ্রীশ্রীমা যেন আমায় শক্তি দিয়ে গেলেন—অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কেত পেয়ে—সর্ব্ব অবস্থায় ধৈর্য্য রাখতে। মায়ের এই স্পর্শ আমার জীবনে পরম সম্পদ—এ স্পর্শের

প্রভাব আমি কথা দিয়ে কাউকে বোঝাতে পারবো না—কেউ বুঝতে চাইবে না—এক মাতৃভক্ত সন্তানেরা ছাড়া!

শ্রীশ্রীমায়ের এই কথাটি না বল্লে মায়ের রূপ ও কথাটি পূর্ণ হবে না।

৬ই মার্চ, ১৯৭২—মায়ের বাবুজীর চোখের অপারেশন হয়। যখন তার চোখের অসহ্য যন্ত্রণা হোত, শ্রীশ্রীমা এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন দেখতাম—স্বপ্নে নয়, জাগরণে।

অপারেশনের কয়েকদিন দেখেছি—শ্রীশ্রীমা আমার মাথার উপরে, শ্রীগুরু-রূপে দাঁড়িয়ে আছেন—সামনে, পেছনে, আশে-পাশে, সর্বক্ষণ—সঙ্গের সাথী হয়ে রয়েছেন। পেয়েছি তাঁর উপস্থিতির অনুভূতি, শ্রীদেহের অঙ্গ-সুবাস; এই মনে হচ্ছে—মা দাঁড়িয়ে আছেন; তাকাতেই দেখছি—মিলিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু, রেখে যাচ্ছেন—তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন—বাতাসে সুগন্ধের সুবাসে!

মাগো! এর সত্যতা একমাত্র তুমিই বলতে পারবে। কিন্তু, আমি জানি—এ আমার মনের ভুল হতেই পারে না। স্নেহময়ী মা তুমি! সন্তানকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়ে, নিজেই যে থাকতে পারো না! তাইতো, ছুটে আসো তার ভার লাঘব করে—তাকে শিখিয়ে দিতে, জানিয়ে দিতে!

চিরদিন তোমার কাছে পরীক্ষার্থিনী হয়ে থাকতে চাই মা। জানি, তুমি তো মা! তুমি তো আমায় ফেলতে পারবে না—কিছুতেই নয়। আমি জানি, এখনও আমার অনেক পরীক্ষার শেষ হয়নি। অনন্ত পরীক্ষার মাঝে, মায়ের পরীক্ষা চলবে আমার জীবনে। তাতে আমি তোমার আশীর্ব্বাদে—ভয় পাবো না, পরম নির্ভয়ে চেয়ে থাকবো—তোমারই দিকে

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি তো ভগবানে বিশ্বাস করো—মা-মা করো—তবুও, তোমার কেন একের পর এক বিপদ আসে?"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"ভগবান আমাকে এখন এত ভালবাসেন যে তিনি চান না যে একমুহূর্তও আমাকে ছেড়ে থাকেন বা আমি তাঁকে ছেড়ে

থাকি। তাই, বিপদের মধ্য দিয়ে তিনি তো আমাকে আরও আপন করে নিচ্ছেন। তাহলে, তাঁকে না ডেকে, আমি কি করে থাকি?"

উত্তর কি আমি দিতে পারি? কেন যে এতবড় কথা মনে হোল, কে যে মনের মাঝে কথাগুলি বলে দিলেন—তুমি আমায় বলে দাও, মাগো! একি শুধু আমার কথার ফাঁকি? না, আমার মায়ের দেওয়া দান? আমার অন্তর জানে—সব কিছুই তার মায়ের কৃপার দান!

মাগো! তুমি তো মহা-ঈশ্বরী, মহা-আবির্ভাবের প্রকাশের মাঝে—সন্দেহের স্থান কোথাও নেই! তোমার আশীর্ব্বাদ—এ জগতের আশীর্ব্বাদ নয়—এই আশিসের ধারা বহে যায় স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর ধারার মতন! আত্মহারা, সমাধিস্থ, তোমার এই আশীর্ব্বাদ—স্বর্গীয় সুষমা বয়ে নিয়ে আসে! তোমার কল্যাণময়ী-রূপ—উদাত্ত আশীর্ব্বাদ—রয়েছে প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি জনের জন্যে

মাগো! তুমি সবাইকে আদর করে বলো—তুমি সুন্দর, তুমি মিষ্টি। যে এই সুন্দর ও মিষ্টি হবার সুযোগ নিতে পারবে—সেই হবে তোমার আশীর্ব্বাদে ধন্য! তোমার আশীর্ব্বাদের মাঝে—সে খুঁজে পাবে তার দিশেহারা পথ!

মাগো! জগতের একটু জায়গাও তো ফাঁকা নেই। সব যে তুমি, তুমিময়—সব তো তোমাকে দিয়েই পূর্ণ! তুমি পূর্ণতাময়ী! প্রতি অণুপরমাণুর ভেতর দিয়ে, তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো—সাথী হয়ে রয়েছো আমাদের সাথে! তাইতো, তুমি-ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্তও কোথা ও নেই! একাধারে তুমি আমাদের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পতি-পত্নী, বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র—পরম আত্মীয় সবাকার।

তুমিই ব্রহ্ম! তুমি ব্রহ্মময়ী! তুমিই অখণ্ড পরম ব্রহ্ম! খণ্ড খণ্ড রূপে—প্রতি অণু-পরমাণুতে—তোমারে জানাই আমার অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনন্ত কোটি প্রণাম!

গুরু-কৃপা, গুরু-সঙ্গ, গুরুর স্নেহ, গুরুর আশীর্ব্বাদেই পরাগতি লাভ হয়—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যে যুগে যুগে পরম গুরুর আবির্ভাব!

মাগো! তোমার চরণে আমাকে শুদ্ধাভক্তি দান করো, আর দাও পূর্ণ বিশ্বাস—অন্তরের অন্তরে! শ্রীশ্রীঠাকুরজীর রূপটি নিয়ে, কল্যাণময়ী মাতৃরূপে, যুগে যুগে বিরাজ করো! মাগো! তোমার অনন্ত কথা, অনন্ত বাণী—যার আদিও নেই, অন্তও নেই। আমার সাধ্য নেই তাকে রূপ দিয়ে, পূর্ণতার মাঝে এনে, শেষ করতে পারি! তুমি যে বিন্দুবাসিনী মা—তোমার সমাপ্তির সীমা-রেখা কি কেউ টানতে পারে! সীমার মাঝে থেকেও যে তুমি অসীম। তাই, তোমার কথা অসমাপ্ত রেখেই—তোমার অভয় বাণী, তোমার ভাব ও ভাষা দিয়ে, তোমার দেওয়া রচনা শেষ করবো।

মাগো! তোমার বাণী দিয়েই বলি—"মহাপুরুষেরা কখনই পুরাতন হন না; আর, পুরাতন হয় না—তাঁদের স্মৃতি, প্রেম ও ভালবাসা!

গুরু সর্ব্বব্যাপী, গুরু মহান, বিরাট, বিশ্বব্যাপী—তাঁর তুলনা তিনিই! তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি অণু-পরমাণুতে বিরাজমান। ইহা বুদ্ধির কথা নয়—ইহাই অনুভূতি। গুরু বিশেষ কোন দেহে আবদ্ধ নন। তোমার গুরু জগদ্‌গুরু! সব গুরুর মধ্যে, তোমার গুরুর প্রকাশ জানিয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রণতি দাও। তিনি অন্তরতম—তোমাদের অন্তরেই আছেন। ভগবানকে পাওয়ার জন্যে গুরুই আলোক-বর্ত্তিকা। গুরুর পরে নির্ভর করে, নাম করে যাও—লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেই। সর্ব্বতোভাবে গুরুর শরণাপন্ন হয়ে, হাত ধরে চল। সরল ভাবে গুরুর শরণ নাও। সংসারের সর্ব্ব প্রলোভনে—তিনিই তোমাদের মনের ময়লা ধুইয়া নির্ম্মল করিয়া—তোমাদের তিনি সৎ ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। সদ্‌গুরুর আশ্রিত হয়ে—তাঁর হও—গুরুর প্রতি আপন-বুদ্ধি জাগাও। নিজেকে দিতে পারলেই, তাঁকে পাওয়া যায়। চাই শুধু—গুরুর প্রতি পূর্ণ শরণাগতি ও পূর্ণ বিশ্বাস!

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শাশ্বত, অব্যয়, অবিনশ্বর। পরমগুরু নিকট থেকে

থাকি। তাই, বিপদের মধ্য দিয়ে তিনি তো আমাকে আরও আপন করে নিচ্ছেন। তাহলে, তাঁকে না ডেকে, আমি কি করে থাকি?"

উত্তর কি আমি দিতে পারি? কেন যে এতবড় কথা মনে হোল, কে যে মনের মাঝে কথাগুলি বলে দিলেন—তুমি আমায় বলে দাও, মাগো! একি শুধু আমার কথার ফাঁকি? না, আমার মায়ের দেওয়া দান? আমার অন্তর জানে—সব কিছুই তার মায়ের কৃপার দান!

মাগো! তুমি তো মহা-ঈশ্বরী, মহা-আবির্ভাবের প্রকাশের মাঝে—সন্দেহের স্থান কোথাও নেই! তোমার আশীর্ব্বাদ—এ জগতের আশীর্ব্বাদ নয়—এই আশিসের ধারা বহে যায় স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর ধারার মতন! আত্মহারা, সমাধিস্থ, তোমার এই আশীর্ব্বাদ—স্বর্গীয় সুষমা বয়ে নিয়ে আসে! তোমার কল্যাণময়ী-রূপ—উদাত্ত আশীর্ব্বাদ—রয়েছে প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি জনের জন্যে

মাগো! তুমি সবাইকে আদর করে বলো—তুমি সুন্দর, তুমি মিষ্টি। যে এই সুন্দর ও মিষ্টি হবার সুযোগ নিতে পারবে—সেই হবে তোমার আশীর্ব্বাদে ধন্য! তোমার আশীর্ব্বাদের মাঝে—সে খুঁজে পাবে তার দিশেহারা পথ!

মাগো! জগতের একটু জায়গাও তো ফাঁকা নেই। সব যে তুমি, তুমিময়—সব তো তোমাকে দিয়েই পূর্ণ! তুমি পূর্ণতাময়ী! প্রতি অণুপরমাণুর ভেতর দিয়ে, তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো—সাথী হয়ে রয়েছো আমাদের সাথে! তাইতো, তুমি-ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্তও কোথা ও নেই! একাধারে তুমি আমাদের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পতি-পত্নী, বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র—পরম আত্মীয় সবাকার।

তুমিই ব্রহ্ম! তুমি ব্রহ্মময়ী! তুমিই অখণ্ড পরম ব্রহ্ম! খণ্ড খণ্ড রূপে—প্রতি অণু-পরমাণুতে—তোমারে জানাই আমার অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনন্ত কোটি প্রণাম!

গুরু-কৃপা, গুরু-সঙ্গ, গুরুর স্নেহ, গুরুর আশীর্ব্বাদেই পরাগতি লাভ হয়—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যে যুগে যুগে পরম গুরুর আবির্ভাব !

মাগো ! তোমার চরণে আমাকে শুদ্ধাভক্তি দান করো, আর দাও পূর্ণ বিশ্বাস—অন্তরের অন্তরে ! শ্রীশ্রীঠাকুরজীর রূপটি নিয়ে, কল্যাণময়ী মাতৃরূপে, যুগে যুগে বিরাজ করো ! মাগো ! তোমার অনন্ত কথা, অনন্ত বাণী—যার আদিও নেই, অন্তও নেই। আমার সাধ্য নেই তাকে রূপ দিয়ে, পূর্ণতার মাঝে এনে, শেষ করতে পারি ! তুমি যে বিন্দুবাসিনী মা—তোমার সমাপ্তির সীমা-রেখা কি কেউ টানতে পারে ! সীমার মাঝে থেকেও যে তুমি অসীম। তাই, তোমার কথা অসমাপ্ত রেখেই—তোমার অভয় বাণী, তোমার ভাব ও ভাষা দিয়ে, তোমার দেওয়া রচনা শেষ করবো।

মাগো ! তোমার বাণী দিয়েই বলি—"মহাপুরুষেরা কখনই পুরাতন হন না ; আর, পুরাতন হয় না—তাঁদের স্মৃতি, প্রেম ও ভালবাসা !

গুরু সর্ব্বব্যাপী, গুরু মহান, বিরাট, বিশ্বব্যাপী—তাঁর তুলনা তিনিই ! তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি অণু-পরমাণুতে বিরাজমান। ইহা বুদ্ধির কথা নয়—ইহাই অনুভূতি। গুরু বিশেষ কোন দেহে আবদ্ধ নন। তোমার গুরু জগদ্‌গুরু ! সব গুরুর মধ্যে, তোমার গুরুর প্রকাশ জানিয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রণতি দাও। তিনি অন্তরতম—তোমাদের অন্তরেই আছেন। ভগবানকে পাওয়ার জন্যে গুরুই আলোক-বর্ত্তিকা। গুরুর পরে নির্ভর করে, নাম করে যাও—লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেই। সর্ব্বতোভাবে গুরুর শরণাপন্ন হয়ে, হাত ধরে চল। সরল ভাবে গুরুর শরণ নাও। সংসারের সর্ব্ব প্রলোভনে—তিনিই তোমাদের মনের ময়লা ধুইয়া নির্ম্মল করিয়া—তোমাদের তিনি সৎ ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর করিয়া দিবেন। সদ্‌গুরুর আশ্রিত হয়ে—তাঁর হও—গুরুর প্রতি আপন-বুদ্ধি জাগাও। নিজেকে দিতে পারলেই, তাঁকে পাওয়া যায়। চাই শুধু—গুরুর প্রতি পূর্ণ শরণাগতি ও পূর্ণ বিশ্বাস !

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শাশ্বত, অব্যয়, অবিনশ্বর। পরমগুরু নিকট থেকে

নিকটতম, তিনিই দূরতম, তিনিই সূক্ষ্ম, তিনিই স্থূল, তিনিই চির-নবীন, তিনিই বৃদ্ধ ; সকলের মধ্যে তিনি, সকলকে নিয়ে তিনি—এসো, তাঁকে আমরা প্রণাম করি।”

পরমগুরু মাতৃগুরু তুমি—লও প্রণাম সবাকার।

শ্রীশ্রীগুরুজীর নিকট মায়ের প্রার্থনা

হে গুরুজী, হে প্রভুজী, জীবের মধ্যে ভালবাসা দাও—তবে, অনন্ত কোটি যে তুমি—তাকে জীব ভালবাসতে পারবে। অভিমান দূর করে, জীবকে হিংসা-মুক্ত কর।

গুরুজী! তুমি যে ছড়িয়ে আছ সবার মধ্যে, সবের মধ্যে, এই বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তি সন্তানদের বুঝিয়ে দাও। নইলে, তোমার সন্তানদের মুক্তির পথ কই! তুমিই হাত ধরে এগিয়ে দাও মুক্তির পথে।

সাধন দ্বারা মুক্তি—এ সাধন আমার নেই। তাই, কৃপাই মুক্তির পাথেয়—এই আমার সাধনা। আমার অহং ভেঙ্গে, সব তোমাময় করে নাও।

বাবা! তোমার কাছে কি চাইবো? যা চাইব, ভুল করে চাইব। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব তুমি তুলে নাও—শুধু ডাকার আনন্দে তোমাকে ডেকে যেতে দাও—আর, তুমি দাও সাড়া!

অনেক কিছু লিখতে চাই, বলতে চাই—ভাষা কই! ভাষাতীতকে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তাই, মনের মধ্যে ভিড় করে আসা ভাব মনেই লয় পেয়ে যায়—মনোময়কে পেয়ে। চাই না ভাষা, করে দাও তদ্‌গত-প্রাণ—তব ভাবে ভাবিতা। হে ভাবময়, ভাষাময়, প্রভু! তুমিই ভবসাগর কাণ্ডারী। জীবনে চলার পথ তোমা-মুখী করে দাও। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়েছ—পঞ্চ-প্রদীপ হয়ে জ্বলে তোমারই আরতি করুক। বাবা! প্রার্থনার অবকাশ রেখো না—আমার কি প্রার্থনীয় তুমি আমার থেকে ভাল জানো—তোমার জানা, আমার জানা সব একাকার করে এক করে নাও। প্রার্থনা যদি আসেই,

তবে যেন তোমাকেই জানি, তোমাকেই বুঝি—এই আমার প্রার্থনা। তুমি যে আনন্দময়, তোমার চিন্তা, স্মরণ, মনন—সবই যে আনন্দে আনন্দময়—প্রতি ধূলি-কণাতেও তোমার আনন্দ ছড়িয়ে আছে—দিকে দিকে তোমার পূর্ণ রূপটি নিয়ে। সবাই করছে তোমার সাধনা—কেউ জেনে, কেউ না জেনে। তোমার নামেই হয় অসাধ্য-সাধন। যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁকে পেয়ে, তুমি হয়েছ সন্তদাস—জয় তোমার জয়!

সন্তানের নিকট মায়ের প্রার্থনা

চির পুরাতন আমাকে তোমরা নূতন করে কোলে নাও। তোমরা তো চির নূতনই আছ—যেন থাকো, এই চাই। হে নবীন! তোমরা নূতন হয়েই থাকো—কচি দুর্ব্বাঘাসের মতন তোমাদের দেহ মন হউক। সুন্দরের বাসনায় তোমরা ফুলের মতন সুন্দর ও নরম হও—প্রয়োজনে বজ্রের মতন কঠিন। তোমরা সুন্দর হয়ে সুন্দরের পূজারী হও।

তোমাদের স্পর্শে সব সুন্দর হউক—এইতো আমি চাই। তোমরা সবল হও—জ্ঞানী হও—দেহ ও মনে।

আকাশে, বাতাসে, তাঁর রংএর যে ছটা ছড়িয়ে আছে—সে রং কুড়িয়ে, সে ধনে ধনী হতে চেষ্টা কর। মঙ্গলময় করুণাময়ের চরণে এই প্রার্থনা।

তাঁকে পাওয়ার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কুণ্ঠিত হ'য়োনা। মিলনের জন্যে প্রস্তুত হও। বিরাটের সঙ্গে মিলন-সেতু হ'লো—গুরু-প্রদত্ত নাম।

আনন্দ থেকে এসেছ—আনন্দেই যেন আবার লয় পেতে পার, তার জন্যে সচেষ্ট হও।

অর্থদ্বারা—গুরুলাভ করা যায় না, গুরুকে বন্ধন করা যায় না; একমাত্র পরাভক্তির দ্বারাই গুরুকে জানা, বোঝা ও বন্ধন করা যায়। সেই পরাভক্তিই তোমাদের হউক—গুরু চরণে সেই প্রার্থনা।

আমি কাঁসর, তোমরা বাজনাদার—যেমন বাজাও, তেমনি বাজি। আমি

গাছ, তোমরা ফুল। শক্তিমান আমি—শক্তি তোমরা। তোমরা ছাড়া আমি নই—আমি ছাড়া তোমরা নও। এর বিচ্ছেদ নেই, মিলন নেই—পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছি ; চির জীবন ও যুগে যুগে যেন থাকতে পারি, তারজন্যে তোমরা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর। শারীরিক সঙ্গ হয়তো ত্রুটিতে ভরা থাকতে পারে, মানসিক সঙ্গই যথার্থ সঙ্গ।

তোমাদের কি বাণী দেব—আমিই তোমাদের বাণী। তোমরা তোমাদের মধ্যে নামের বান আন, প্রেমের বান আন। প্রেমের বান এলেই, তার থেকে আসে বাণী—তাঁকে না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের নামের যেন বিরাম না হয়। তোমাদের অন্তরও বাহিরে যেন এক বাণী জাগে—তুমি আছ, তুমি আছ—আমার অন্তরতম তুমি—ভিতরে আছ, বাহিরে আছ, তুমি প্রকাশিত হও।

তোমাদের জন্যে সাধন তো আমিই কোরছি। তোমরা শুধু, একটু সাহায্য করে যাও—তোমাদের কাজ দিয়ে। সাধন তোমাদের করতে হবে না। খেলা ভালবাস—তোমরা একটু সাধন সাধন খেলা খেলিও—এই অনুরোধ।

বলেছি তোমাদের অনেক কথা—সকল কথার মাঝে একটি কথাই লুকিয়ে আছে। তোমরা তাঁর হও, তাঁকে জান। যত কথা বলেছি, যত উপদেশ দিয়েছি, তার একটি বাণীরও যদি রূপ দান করে, প্রাণবন্ত করে তোল—তবে আমার বাণী দেওয়া, তোমাদের মা হওয়া সার্থক! আমার বাণীকে তোমরা রূপ দাও।

'মা'

জয় গুরুজীর জয় জয় জয়। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর চরণে সন্তানের প্রার্থনা

মাগো! তোমার বাণীর গভীর উক্তি—তোমার অন্তরের গভীর মিনতি—তোমার একটি বাণীর রূপ ও তোমার সন্তানেরা রূপায়িত করতে পারলে—তোমার বাণী ও মাতৃত্ব সার্থক হয়ে উঠবে! সন্তানের মঙ্গল কামনায় তোমার বাণী—তোমার আন্তর ভাবনারই অমৃতময় রূপান্তর!

মাগো! তোমার চরণে এই প্রার্থনা—তুমি তোমার বাণীর অমৃত-সুধা-সঞ্জীবনী দিয়ে যাও, বলে যাও, ছড়িয়ে দিয়ে যাও—কাছের ও দূরের সবারই মধ্যে। তোমার বাণীর অপূর্ব্ব ব্যাঞ্জনা উর্দ্ধলোকের গান এনে দেবেই দেবে সবার মনে ও প্রাণে—তোমার স্নেহপূর্ণ বাণীর অমৃতময় স্পর্শ, আত্ম-চেতনা এনে দেবেই দেবে, সন্তানদের মধ্যে। গুরুর প্রতি পরম নিষ্ঠায়, গুরুর আশীর্ব্বাদের পরম-চেতনায়, গুরুর স্মরণে, মননে, গুরুর প্রতি আত্মসমর্পণে—জীবনের চলার পথ তোমা-মুখী হবেই হবে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসই সহজ সরল করে দেবে তাঁর কাছে যাবার পথ।

তোমার বাণী তুমিই তোমার জীবনের চলার পথে রেখে দিয়েছ, মা-মণি, তোমার সন্তানদের জন্যে—সে তো বৃথা হবার নয়। কখনই বৃথা হতে পারে না—সুন্দরের সংস্পর্শে সবাইকে হতেই হবে সুন্দরতম। মাগো! তোমার কথা, তোমার বাণী, তোমার আত্ম-সমাহিত ভাব নিয়ে যায় কোন উর্দ্ধলোকে—যার ঠিকানা আমার জানা নাই। মনে বিরাজ করে পূর্ণ শান্তির পরম তৃপ্তি। তোমায় দেখি আলোর শিখার মতন জ্বলছো—হৃদয়ের গভীরে—অনির্ব্বাণ উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিকীর্ণ হয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছো—হৃদয়ের দিগ-দিগন্তে।

মানুষ আমরা বড়ই দুর্ব্বল। কামনা-বাসনার উর্দ্ধে উঠতে পারি কই? মন যে বারবারই নীচে নেমে আসতে চায়, জাগতিক জীবনের চাহিদায়—হিংসা-দ্বেষ, মান-অভিমান, সব নিয়েই জড়িয়ে পড়ে আছি আমরা—সংশয়-ভরা মন সব সময় সংশয়ে আছন্ন।

তাই তোমার চরণে নতজানু হয়ে, শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে, প্রার্থনা জানাই—মাগো! তুমি তো আমাদের সব কিছুই উজাড় করে, বিলিয়ে দিয়ে বসে আছো—তোমার বাণীর একটি রূপের উপলব্ধি ও যেন আমাদের জীবনে আসে—তাঁকে মাতৃনামে রূপান্তরিত করে, পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে—তবেই তো আমরা—তোমার সন্তানেরা মায়ের উপযুক্ত

মর্য্যাদা দিতে পারবো—সেই শক্তি তুমি আমাদের দাও মা—তোমার শক্তি হতে মোদের শক্তি দান কর।

আমাদের তুমি দয়া করে, কৃপা করে, ক্ষমা করে, নিয়ে যাও তোমার ভালবাসার গভীরে—তোমার স্নেহ-ভালবাসার আলোই তাঁর কাছে যাবার পথ দেখাবে—তোমারই আলোর জ্যোতির আশীর্ব্বাদে!

মাগো! তোমার সংস্পর্শে এসে, মনের বদ্ধ দুয়ার যেন খুলে যায়। আলোয় আলোয় যেন ভরে যায় অন্তর ও বাহির—সেখানে না থাকে যেন অবিশ্বাসের ছোঁওয়া—সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাসই তোমার সাথে, পরম গুরুর সাথে, স্নেহ ও পূর্ণ বিশ্বাসের অপূর্ব্ববন্ধনে করে রাখে আবদ্ধ।

বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে মস্ত বড় একটা গণ্ডী টানা আছে। সে গণ্ডী পেরিয়ে আসা বড় সহজ কথা নয়—চাই, পরিপূর্ণ বিশ্বাস। পূর্ণ বিশ্বাসের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায়—চরম উপলব্ধির অনুভূতি। মন তো আমাদের সংশয়ের দোলায় সব সময়ই দুলে চলছে; আর ভেবেই চলছে—এ ভাবনার শেষ কোথায় কেউ জানে না।

তাই তো মাগো! তোমার চরণে প্রার্থনা—দাও আমাদের সহজ, সরল, বিশ্বাস—যে বিশ্বাসের দৃঢ় মূল তোমাতেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে একাঙ্গীভূত হয়ে; যে বিশ্বাসের দৃঢ় মুল তোমারই স্নেহের উৎস-ধারায় করে রাখে সঞ্জীবীত।

মাগো! দাও আমাদের তাঁকে পাওয়ার ব্যাকুলতা—জানিয়ে দাও, তিনিই এ জগতে একমাত্র আপন-জন। এ জীবনে এত আপন আর কেউ নন। জীবনটা যে তাঁরই; তাঁকে আমার চাই-ই-চাই। সর্ব্বপ্রকারে, অন্তরে, বাহিরে, যেন তাঁরই হয়ে উঠতে পারি—তাঁকে নিয়েই পূর্ণ হতে পারি—সেই বোধ মোদের দাও গো, মা জননী। সর্ব্বতোভাবে, গুরুচরণে মোদের সমর্পণ করে, হতে করো আশীর্ব্বাদ। পরম গুরুর চরণে, শ্রীগুরুর চরণে যেন সম্পূর্ণভাবে শরণাগত পারি, তোমার চরণে সেই প্রার্থনা।

মাগো! সেই মনশ্চক্ষু দান করো—যে চোখ অহরহ পায় পরমগুরু করুণাময়ী মায়ের দরশন ; এমন কণ্ঠ দান করো, যে কণ্ঠ মায়ের নাম-গানে বিভোর হয়ে থাকতে পারে ; দুটি হস্ত যেন মায়ের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত থাকতে পারে ; এমনি দুটি চরণ দাও, যে চরণ চলার বিরাম না করে, মায়ের চরণে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে পারে—এমন অন্তর ও হৃদয় দান করো, সে যেন তদ্‌গত-চিত্তে হতে পারে মা-ময়।

মাগো! জগতের মায়ার রূপে যেন মুগ্ধ হয়ে না পড়ি—দু'দিনের খেলায় ভুলে কি হবে? অন্তরে অন্তরে যেন তোমার চিররূপের খেলায় আছন্ন হয়ে থাকি—সেই তোমার পায়ে আমার একমাত্র প্রার্থনা।

চির নবীন তুমি, চির সবুজ তুমি, চির আশ্রয় তুমি—তুমি আমাদের পরমমাতা শ্রীশ্রীশোভা মা।

মন আমার গভীর আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে—সেই আবেগ প্রকাশের ভাষা আমার জানা নাই। মাগো, শুধু জানি—তুমি আছ, সর্ব্বময়রূপে তুমি আছ, দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকায় তুমি ব্যাপ্ত—বিরাট বিশ্বময়ীরূপে বিরাজমান—পরমগুরুরূপে সন্তান-বৎসল-জননী—শ্রীশ্রীশোভা মা!

মাগো! ভক্তি, মুক্তি, কিছুই জানিনা মা—শুধু, জানি আমি তোমাকে—তুমি যে মা আদিতে, তুমি যে মা অন্তে। তুমি যে মা আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে—তুমি যে মা আমার বহিরাঙ্গণে—তুমি যে আমার অন্তরে—তুমি যে আমার বাহিরে—স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, মঙ্গলময়ী-রূপে—শ্রীশ্রীশোভা মা!

মাগো! আমার সকল অহং দূর করে, আলোর চেতনার ধ্যানে ভাসিয়ে নিয়ে যাও—দাও মোরে পরম বিস্ময়, পরম অভয়—করো মোরে পূর্ণ শরণাগত। তোমারই হাত ধরে যেন জগতের পিছল পথ পাড়ি দিতে পারি—মনপ্রাণ সমর্পণ করে, নিজের বলে কিছুই না রেখে। উপলব্ধির ফলে, অন্তরঙ্গভাবে, খুঁজে পাই তাঁকেই—তোমার মাঝে।

অন্তরের তরঙ্গ-দোলায় মিলে মিশে এক হয়ে যেতে পারি, পরম জীবনের

পরম সত্তায়—পরম উপলব্ধির মাঝে। তোমারই তরঙ্গ-দোলায় দুলে দুলে আমরা যেন ভেসে যেতে পারি, মিলে মিশে যেতে পারি তোমার সাথে এক স্রোতে, তাঁকে পাবার আশায়—যেখানে নাই কোন ভয়—নাই কোন মান-অভিমান, নাই কোন চাওয়া-পাওয়া—শুধু, আছে পরম ভালবাসা ও পূর্ণ বিশ্বাস।

মাগো! তোমার কাছে এই মিনতি, এই করুণ প্রার্থনা—যে হৃদয় একবার তোমা দিয়ে ভরে দিয়েছ উজ্জ্বল জ্যোতিতে, তাকে সরিয়ে দিও না, নিভিয়ে দিও না। আর তো তোমার কাছে কিছু চাইনি—চাইনি মান, যশ, প্রতিপত্তি—চাইনি সুখ, অর্থ, সম্পদ—শুধু তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা।

দাও আমার অন্তরে উপলব্ধির অনুভূতির আলো—যে আলোতে আমার মন-প্রাণ আনন্দ-শিহরণে পুলকিত হয়ে উঠবে; অন্তর উঠবে জেগে—অন্তর্মুখী আনন্দ-অশ্রুধারায়, অশ্রু-সজল চোখের দৃষ্টি আমার মায়ের মাঝে লীন হবে, পরিসমাপ্ত হবে।

যুগে যুগে তুমি এসেছ মাগো! বহু রূপ ধরি, মুছায়ে দিতে সন্তানের অশ্রু-রাশি—আপনার হাতে টানি লয়ে শান্ত বক্ষোপরে। যুগে যুগে বাঞ্ছিতের কল্পতরুরূপে দেখা দিয়েছ—দিচ্ছ। কতদূর দু'হাত বাড়িয়ে বসে আছ—সন্তানকে কোলে টেনে নিতে—তবুও কি তোমাকে কি চিনতে পেরেছি! তুমি যে পরমগুরু স্নেহময়ী জননী। তোমাকে পাবার ক্ষুধা—সেই বিশ্বগ্রাসী-ক্ষুধা আমাদের কই মা? শুধু, তোমার কাছে দাও দাও করে ঝুলি পূর্ণ করে নিতে চাই ঝুটা রত্ন দিয়ে—আসল রত্ন তো কেউ চাই না, মা! আসল রত্ন সেই প্রেমের মণি-মাণিক্য—তুমি তো দু'হাত ভরে নিয়ে বসে আছ। কিন্তু, আমাদের অন্তর্দৃষ্টিই বা কোথায়—সেই রত্ন আমরা চিনবোই বা কি করে—তুমি চিনিয়ে না দিলে? শুধু, চিনবার ভান করবো মাত্র—সত্যিকার চিনতে বা বুঝতে পারবো না, তোমার কৃপা ছাড়া।

মাগো! তুমি আমাদের দয়া করো, তুমি আমাদের কৃপা করো—তোমার

কৃপা বিনা সব বৃথা। মোহগ্রস্ত যেন না হই—সে তো দু'দিনের। হৃদয়ে দাও মা, আকুলতা—দাও মা, পরম ব্যাকুলতা—পরম লগ্ন যেন আসে সবার জীবনে, তোমার আশীর্ব্বাদে। তোমার সন্তান আমরা, সেই যেন হয় মোদের সব চেয়ে বড় পরিচয়।

মাগো! আমি সাধনহীন, ভজনহীন, জ্ঞানহীন; তবুও, আমি তোমার সন্তান। তাইতো, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা—দাও আমাকে তোমার চরণে শ্রদ্ধাভক্তি। অন্তরের অন্তরে তুমি মোদের পরমজননী হয়ে—ব্রহ্মময়ী মা হয়ে, যুগে যুগে আমাদের অন্তরে বিরাজ করো—তোমার নামের শোভা আমাদের হৃদয়ের শোভা হয়ে অধিষ্ঠিত হউক।

সর্ব্বরূপে মা, সর্ব্বস্থানে মা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মহারূপে মহাযোগিনী মা—সেই মাতৃচরণে নিজেকে নিবেদন করে ধন্য হই—পূর্ণ হই।

মাগো! তোমার কাছে আমরা শরণাগত। সন্তান আমরা, যত অন্যায়ই করি না কেন—তোমার পরে দাবী মোদের অসীম। তোমার স্নেহের কল্যাণ-স্পর্শে, ক্ষমা করে আমাদের, তোমার সু-সন্তান হবার যোগ্য করে নিও মা। মন যেন সর্ব্বতোভাবে পরম-গুরুতেই নিবিষ্ট হতে পারে। তোমার প্রতিটি বাণীর রূপ উপলব্ধি করে, আমরা পরম বিশ্বাসে, অতি আপনভাবে, নির্ভয়ে, এগিয়ে যেতে পারি—একান্ত শরণাগত হয়ে।

তুমি ব্রহ্মময়ী, তুমি স'চ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দময়ী, পরম সত্য, পরম জ্ঞান, পরম ধর্ম্ম—কালের কোলে মা আদিজননী—ধর্ম্মস্থাপনের জন্যে যুগে যুগে তোমার আবির্ভাব।

মাগো! সবার অন্তরে যে দীপটি জেলে দিয়েছ—সে প্রদীপের দীপ্তশিখা—চির উজ্জ্বল, অনির্ব্বাণ, হউক সবার জীবনে।

মাগো! তোমার চরণে প্রার্থনার তো অন্ত নেই। আমার এ জীবন-সায়াহ্নে তোমায় আরতি কোরবার যে সুযোগ তুমি দিয়েছ—সেই তোমারি বন্দনা-গানে আমায় মুখর করে রেখো মা। জীবনের শেষ প্রান্তে—দীর্ঘপথ

পাড়ি দিয়ে, শ্রান্তির খেলাচ্ছলে—তোমার পদচ্ছায়া-তলে আশ্রয় নিয়ে—তোমার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে যজ্ঞাহুতি দিতে পারি—সেই আশিস্‌ই তোমার কাছে—দীন-হীন নম্রচিত্তে ভিক্ষা কোরছি।

জননী গো! তোমার শ্রীচরণে আমার অন্তরের যুগযুগান্তের ভক্তি, প্রীতি, ভালবাসা, উচ্ছ্বাস, শ্রদ্ধা ও অনন্ত কোটী প্রণাম রাখলাম।

"জয় শ্রীপরমগুরু শোভামাতাজী কী জয়!"

শ্রীশ্রীশোভামায়ের পত্রাবলী

(১৯৭০, মে হইতে ১৯৭৩ মার্চ্চ)

"প্রকৃত মাতৃত্ব সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করে—গুরুপদ-নির্দ্দেশ-দান করে। সন্তানের কল্যাণ-কামনা মাতৃত্বের ধর্ম্ম।"——মা।

সন্তান-কল্যাণকামী মায়ের প্রতি পত্রের ছত্রে ছত্রে রয়েছে অশেষ কল্যাণ-ভাবনা—সুনির্দ্দিষ্ট পথের সুচিন্তিত নির্দ্দেশনা—আশিস্-করুণা-কৃপার অনন্ত-ধারা; শোকে-দুঃখে, স্নেহ-সান্ত্বনা; হতাশ ও ক্লান্ত মনের উৎসাহ-প্রেরণার—অপূর্ব্ব, অমৃত-প্রকাশ!

শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরের গভীর ভালবাসার আন্তরিক স্নেহস্পর্শ—নিবিড় সুখ-স্পর্শে অভিভূত করে সন্তান-হৃদয়—নিরাশার প্রাণে জাগে আশার আলো। পত্রের বাণী মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠে—সন্তান-হৃদয়ে জাগে নবপ্রেরণা—উৎসাহ—উদ্দীপনা—আনন্দে চোখে আনে অশ্রুধারা। উন্মুখ, উৎসুক সন্তান—শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাশিসের মধ্যেই লাভ করে জীবনের পরম রতন—সুধাভাণ্ডের অমৃত-সঞ্জীবনী—জীবনে চলার পথের গভীর ইঙ্গিত!

তাই আজ মায়ের পত্রগুলি—যা এনে দিয়েছে আমার জীবনে অমৃতের পরশ, স্নিগ্ধ-সান্ত্বনা, শক্তি ও প্রেরণা, পথের নির্দ্দেশনা—মাতৃস্নেহের বাৎসল্য রসের

অনন্ত মহিমার অপূর্ব্ব নিদর্শন—তারই কিয়দংশ—শ্রীশ্রীমায়ের আন্তর-রূপের অমৃত-প্রসাদ-স্বরূপ—তুলে ধরতে চাই—ছড়িয়ে দিতে চাই—সবার মাঝে। "মাগো! দিও তোমার করুণা-কৃপার সম্মতির আশীর্ব্বাদ।"

"জয় মা"

(প্রথম পত্র)

১

কল্যাণী—৮. ৭. ৭০.

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুকা মা—তোমার প্রেরিত কবিতাটি পাইয়াছি। আমার এবং এখানের আর সকলের কবিতাটি ভাল লাগিয়াছে। আমার এই মিষ্টি মাকে পাইয়া আমারও খুব ভাল লাগিয়াছে……মাতৃহৃদয় সন্তানের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকে। তোমার যে এই "মাটিকে" ভাল লাগিয়াছে—তোমার সুন্দর মনেরই পরিচয়। নিজে ভাল হইলেই সব কিছু ভাল লাগে। ৺তিনি আনন্দময় বলেই তো আমাদের জগৎকে এত আনন্দময় বলে মনে হয়। এ জগতে সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিন গুণের খেলা চলিতেছে—সব সময় তার থেকে সত্ত্বকে আহরণ করিবার চেষ্টা করিবে……উৎসবে আসিতে চেষ্টা করিও—উৎসব মানেই—সবাইকে নিয়ে আনন্দ করা……আদর আশিস্ নাও—রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

২

বারাণসী—১৯. ৮. ৭০

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুমা!……মা সোনা, তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়া আমারও খারাপ লাগিতেছে। তবে, একথা মনে রাখিও, মা স্থূলতঃ যত দূরেই থাকুন না কেন, তোমাদের সঙ্গেই আছেন।

মায়ের কাছে সন্তান সকল আব্দারই করিতে পারে—সকল কথা জানাইতে পারে, তাহাতে সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।

তোমাদের মা তোমাদের জন্যেই আছেন। তোমার বোনেরা খুব সুন্দর ঝুলন সাজাইয়াছিল······রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৩

হরিদ্বার—১৮. ৯. ৭০.

নারায়ণেষু,

আমি গত ৪।৯ তারিখে হরিদ্বার পৌছিয়াছি। তোমাদের শুনিয়া ভাল লাগিবে, এবার বেনারসে তোমাদের ভাই-বোনেরা সকলেই মিলিত হইয়া দুর্গাপূজা করিতেছে।······মা সোনা—তোমার সুন্দর মনটা যাহাতে সুন্দর থাকে, সেই চেষ্টা করিও। সুন্দরের পূজায় মন সুন্দর হয় জানিবে—সব সময়ই সত্যাশ্রয়ী হইতে হইবে। "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"—এই কথাটি সব সময়ই মনের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিবে। সংসারে চলার পথে নানারকম বাধা-বিপদ-ঘূর্ণিপাক আসেই—ভগবৎ-নাম ও তাঁহার শরণাগতির দ্বারাই মানুষ এই ঘূর্ণিপাক হইতে উদ্ধার পায়। সংসার হইতে দূরে গেলেই মন শান্ত হয় না—সংসারে থাকিয়াই তাঁহার নামের দ্বারা মন শান্ত হয়। সংসার তো তাঁহারই রূপ।······রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৪

সন্ত-আশ্রম, বারাণসী
১২. ১২. ৭০.

মা সোনা!

সবকিছু ভগবৎ-ইচ্ছাতেই হইতেছে। বিশ্বাসে যে আঘাত আসে, তাহাও তাঁহারই ইচ্ছায়। প্রকারান্তরে তাহার দ্বারা মঙ্গলই সাধিত হয় জানিবে।

৺ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাইবার কোন কারণ নাই। ৺তিনি তো মঙ্গলময়। সব সময়ই আমাদের মঙ্গলই সাধন করিতেছেন। সর্বাবস্থাতে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াই পথ চলিতে হইবে। ৺তিনি যে আমাদের মঙ্গল-বিধান করিতেছেন, এ বিষয় কোন সংশয় রাখিও না। ......

তুমি তোমার মন হইতে অবিশ্বাসের ভাবটুকু দূর করিতে চেষ্টা করিও। যদি কেহ তোমার সাথে অবিশ্বাসের কাজ করে, তবে ফল তো তাহাকেই পাইতে হইবে ; তুমি শুধু অবিশ্বাস করিয়া—শুধু শুধু, কেন কষ্ট পাও ?

কল্যাণী গেলে তোমার সাথে দেখা হবার সম্ভাবনা আছে—ভাবিতেও ভাল লাগে।......রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৫

বারানসী—১৭. ৩. ৭১.

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুমা সোনা !...তোমার বড় পত্রগুলি পড়িতে আমার বড় ভাল লাগে।......

তুমি যদি জপের সময়, করে সংখ্যা না রাখিতে পার, তাহা হইলে কিছু ক্ষতি হইবে না। তুমি তোমার ভাবের মধ্য দিয়াই জপ করিয়া যাও—তাহা হইলেই ভাবময়কে পাওয়া যায় জানিবে।

দেওয়ার মালিক ৺যিনি, নেওয়ার মালিকও ৺তিনি। দেওয়া-নেওয়া দু'টোকেই যদি আমরা সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমাদের আনন্দের অভাব হইবে না। ৺ভগবানের নামের মধ্যে বিরাট শক্তি রহিয়া গিয়াছে। যতই নাম করিতে পারিবে, ততই মন শক্তিশালী হইবে।...৺ভগবৎ-নামপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সাধারণ সুখ-দুঃখে এতটা বিচলিত হন না।......তুমি যেখানেই থাক, তোমার মা গুরুরূপে, ছায়ার ন্যায়, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন—জানিবে। তুমি কখনও মায়ের কাছ ছাড়া নও।......রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—মা

৬

৮. ৩. ৭১.

নারায়ণেষু,

……অসুবিধার মধ্যেও যে তোমরা আনন্দ পাইয়াছ—ইহা তোমাদের বড় মনেরই পরিচয়। কারণ, এই উৎসবের মধ্যে কাহারও প্রতি যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় নাই। তোমরা যদি আনন্দ পাইয়া থাক—তবে, ইহা আমার প্রতি ৺বাবার বিশেষ কৃপা বলিয়াই মনে করিবে।……তোমাদের কাছে পেয়ে বড় আনন্দ পেয়েছি। মায়ের মন ভরিয়া ওঠে—সন্তানদের কাছে পেলে। জব্বলপুর যাওয়া ঠিক হয়েছে। রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৭

বারাণসী—৩. ৪. ৭১

নারায়ণেষু,

জব্বলপুর থেকে খাজুরাহো, মাইহার, নাগপুর ইত্যাদি স্থানে তোমাদের মা ভ্রমণ করে আশ্রমে ফিরে এসেছেন। সেখানকার তোমাদের গুরু-ভাইবোনদের আদর-যত্নে অত্যন্ত প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেছেন।……প্রেমময়ের সাধনায় নিজেদের প্রেমিক করে গড়ে তোল। জীবনের সুখ-দুঃখে, জয়-পরাজয়ে—সর্ব্ব অবস্থায়—তাঁকে স্মরণ রেখে, পথ চল—এই প্রার্থনা।……তুমি শ্রীশ্রীরাধা-বিহারীজীকে যেরূপ দর্শন করিয়াছিলে তাহা তোমার প্রতি তাঁর কৃপা বলিয়াই জানিবে।

আশীর্ব্বাদিকা—মা

৮

বারাণসী—১৯. ৪. ৭১.
নববর্ষ—১৩৭৮ বাংলা

নারায়ণেষু,

……আজ নববর্ষের নব প্রভাতে আবার আমার আদর আশিস্ জানাই। পরম মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদে আমরা আর একটি বছর এগিয়ে

এলাম। কিন্তু, আমাদের সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে—আমাদের এই এগোন যেন ভগবৎমুখী হয়। মন অন্তর্ম্মুখী হয়ে তাঁকে লাভ করার আকুলতা যেন বাড়ায়। এই পরম প্রিয়জনকে আমরা যেন ভুলে না থাকি। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তা না হলে, বছরের পর বছর পার হয়ে যেয়ে তো কোন লাভ হবে না—শুধু আয়ুক্ষয় হয়ে জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলবে। আমরা উদাত্তকণ্ঠে বলবো—অসৎ থেকে আমার সতে নিয়ে যাও—অন্ধকার থেকে আমাকে আলোতে নিয়ে যাও—মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে যাও।

আলোকময়কে দেখে আমাদের জীবন যেন সার্থক হয়। আমরা যেন তাঁর চরণের নূপুর হয়ে বাজতে পারি। আজ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে এই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। তোমাদের চেষ্টার পিছনে আমার গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ আছেই জানিবে। নির্ভয়ে নির্ভরশীল হয়ে চেষ্টা করে যাও। তোমাদের কাছে আমার এই প্রার্থনা। তাঁকে পেয়ে ভাল থাক।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৯

১. ৫. ৭১.

নারায়ণেষু—

তোমার পত্রগুলি যত বড় হয় ততই আমার ভাল লাগে। তোমার লেখা কবিতাগুলি তো অপূর্ব্ব।...মা সোনা! আমি মাঝে সত্যিই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার এই অসুস্থতা তোমার কাছে ধরা পড়ায়, আমার কিন্তু ভালই লাগিয়াছে।

গুরুর সহিত যতই একাত্ম-বুদ্ধি আসে, ততই তাহার খবরা-খবর এইভাবে ফুটিয়া উঠিবে জানিবে। নিজের 'আমি' ভুলে, একেবারে 'তিনি'-ময় হইয়া

যাও—আমি ও ইহাই চাই। যে নাম পাইয়াছ নিষ্ঠাপূর্ব্বক করিয়া যাও—নামীর দর্শন পাইবে।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১০

১১. ৫. ৭১.

নারায়ণেষু—

মার কাছে সবই চাওয়া যায়—মাতো তোমাদের জন্তেই আছেন। কে বলে আমার মেয়েটি অকর্ম্মন্ত? মায়ের কোলে সবার জন্তেই স্থান আছে। যখনই সুযোগ-সুবিধা হবে, মায়ের কাছে চলে এসো। আদর আশিস নাও।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১১

২৮. ৫. ৭১.

নারায়ণেষু—

মা সোনা! তোমার সুন্দর দর্শনের কথা জানিলাম। এ সব দর্শন তাঁরই বিশেষ কৃপা মনে করিয়া আনন্দের ভিতর দিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। তিনি ত তোমাকে আপন করিয়া কোলে নিয়াছেন; কাজেই তিনি কৃপা করিয়া মাঝে মাঝে তাঁর মিষ্টি রূপের দর্শন দেন।……

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১২

কল্যাণী—২৭, ৭. ৭১.

নারায়ণেষু…

তোমার সুস্থতার খবরের জন্য মনটা বড় ব্যস্ত হইয়াছে। তোমরা ভাল আছ জানিলে আমিও ভাল থাকি। কিন্তু, তোমরা ভাল না থাকিলে আমার

একটুও ভাল লাগেনা···সকল কাজেই তাঁহাকে স্মরণে মননে রাখিয়া কাজ করিয়া যাইও। তিনি তোমাদের সর্ব্বতোভাবে ধরিয়াই আছেন···রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১৩

বারাণসী—১০. ১০. ৭১

নারায়ণেষু—

দেহ থাকিলে তো একটু আধটু অসুস্থতা থাকিবেই। তোমাদের ভালবাসা ও প্রার্থনাতে আমি ভালই থাকি। তোমরা মন খারাপ করিয়া কষ্ট পাইও না।

অশীর্ব্বাদিকা—

মা

১৪

২৫. ১০. ৭১

নারায়ণেষু—

মা সোনা! বাবুজীর চোখের অসুস্থতার কথা জানিয়া তার জন্যে খুবই চিন্তিত আছি। যখন যে অবস্থা আসে তাঁহারই দয়ার দান বলিয়া শান্ত মনে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করিও! শান্তির কথা জানিয়াও মনটা বড় খারাপ হইয়া আছে।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১৫

সন্ত-আশ্রম, বারাণসী

২৭. ১০. ৭১.

নারায়ণেষু—

তোমার পত্রে বাবুজীর অসুস্থতার কথা জানিয়া তোমায় একটা পোষ্টকার্ড দিয়েছি।···যখন যাহা করণীয়, একটুও দেরী না করিয়া, করিয়া ফেলিও।

তাহার চিকিৎসার ব্যাপারে কোন দিক থেকে যেন কোন ত্রুটি না হয়—সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তোমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত খুবই চিন্তিত থাকিব।

…মা সোনা! তুমি যে ঠাকুরজীর চোখে অশ্রু ও ছল্ ছল্ দেখিয়াছিলে—তাহা আমার মনে আছে। তখন ইচ্ছা করিয়াই এই ব্যাপারে তোমায় কিছু বলি নাই। জীবনে যখন যে অবস্থা আসে—শান্ত মনে মানিয়া নিতে পারিলেই শান্তি।

আমি লিখিয়া দিয়াছি, যদি শান্তির কলিকাতায় কিছুই করণীয় না থাকে, তবে, আমার ছেলেকে যেন আমার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া আনে।

বাবুজীর জন্যে মনটা বড় ব্যস্ত হইয়া আছে…

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

১৬

১১. ১১. ৭১.—বারাণসী

নারায়ণেষু…

বাবুজীর চোখের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে জানিয়া বড় ভাল লাগিল। …জীবনে তাঁর উপর নির্ভরশীল হইতে পারিলেই, প্রকৃত শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। আমার বলিয়া যতই ধরবে, ততই দুঃখ টানিয়া আনিবে। তাঁর বলিয়া যতই ছাড়িবে, ততই আনন্দ পাবার পথ প্রশস্ত হইবে। যতটা সম্ভব, পরনিন্দা-পরচর্চ্চা থেকে নিজেদের বিরত রাখিবে। বরং, নিজের দোষ কোথায়—সেটা দেখিয়া সংশোধনের চেষ্টা করিবে। নিজে যদি ভাল হওয়া যায়, তবেই, অন্যের ভাল করা যায়—জানিবে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তাঁকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিও। যে কোন কাজে, আগে তাঁকে স্মরণ করিয়া নিবে। তাঁর স্মরণ-মননে তাঁরই আশীর্ব্বাদ লাভ করা যায় জানিবে। তোমরা তাঁর কৃপালাভের

অধিকারী হও—এই প্রার্থনা করি। তোমার বড় ছেলে গৌতমের খবর পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম···রাধেশ্যাম। আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১৭

১. ১২. ৭১.—বারাণসী

নারায়ণেষু—

মাতৃমন তোমাদের খবর পাওয়ার জন্যে সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব থাকে। শিশু যেমন ভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়—তোমরা তেমনি ভাবে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হও—এই ইচ্ছা করি। তাঁর উপর ছাড়িতে পারিলে, তিনি তোমার সম্পূর্ণ ভার নিবেন। এমনিতেই তোমার আমার ভার তাঁরই উপর। তুমি তখন তা অনুভব করিতে পারিবে। অনুভবে পাবে আনন্দ।···

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১৮

১২.১২.৭১. বারাণসী

(পাকিস্তান যুদ্ধের সময়)

নারায়ণেষু—

বর্ত্তমান দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে, একমাত্র ৺ভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে চলাছাড়া পথ নাই। যে, যে কাজই কর না কেন, মনে মনে সব সময়ই নাম করে যাবে। ৺নাম করতে করতেই নামীকে পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। তাঁর দিকে এগিয়ে যতই যাবে, ততই পাবে আনন্দ। পেলাম না বলে, হতাশ হইও না। কোন জিনিসই চট্ করে পাওয়া যায় না। একটা গাছ লাগালেও তো ফুলে ফলে সুশোভিত হ'তে সময় লাগে। তোমাদের মধ্যেই যে বীজ বপন করা হয়েছে, তা যদি ঠিক মত জপ করতে পার, সময়ে তাতে তোমরা ৺ভগবৎ-দর্শন লাভ করে নিশ্চয়ই ধন্য হতে পারবে। তার জন্যে চাই বিশ্বাস ও ৺গুরুর

উপর নির্ভরতা—এ দুটো পাওয়ার জন্যে তোমরা নিজেদের তৈরী কর।... গৌতমের জন্যে তোমাদের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। আমার ও চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। আমার ও চিন্তা হইতেছে। তবে, সর্ব্বচিন্তার ভার চিন্তামণির উপর ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যখনই চিন্তা হইবে মনে মনে ৺নাম করিয়া যাইও।

গৌতমের খবর পাইলে আমাকে জানিও।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

১৯

২০.১২.৭১.—বারাণসী

নারায়ণেষু—

...ইতিমধ্যে গৌতম তোমাদের কাছে আসিয়া গিয়াছে জানিয়া আরও আনন্দিতা হইলাম।...এর মধ্যে ভারতবর্ষের জয়ের আনন্দে তোমরা নিশ্চয়ই খুব খুশী। এই খুশীর মধ্যেও আমাদের গীতার বাণীকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥

অর্থ—ভগবান বলিতেছেন—সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া, তুমি যুদ্ধে আপনাকে নিযুক্ত কর। এইরূপ করিলে তোমার কোন পাপ হইবে না।

আমরা যদি গীতার বাণীকে যথার্থ রূপ দিয়া জীবনে চলিতে পারি, তবে, কল্যাণের অধিকারী হইব। তোমরা তোমাদের চেষ্টাকে ঐ দিকে এগিয়ে নিয়ে যাও—এই প্রার্থনা।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২০

সন্ত-আশ্রম, বারাণসী
১.১.৭২

নারায়ণেষু—

আদরের রেণুকা মা সোনা!

…নাতিদের পাইয়া মায়ের কথা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? তা, ভুল—আপত্তি নেই—তবে সবাই সুস্থ আছ তো?…সত্য এবং ন্যায়ের পথে চলিতে চেষ্টা করিবে। জীবনে চলার পথে নানা প্রলোভন আসিতেই পারে, নিজেদের মনের জোরে প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। নাম-জপ যত করিবে, ততই মনের জোর বাড়িবে। জপের আগে, ধ্যান যাহাতে সুন্দর হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। ধ্যানে মন নিবিষ্ট না হলে, সাধন-জীবন আরম্ভই হয় নাই—জানিবে। ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে মনকে নিবিষ্ট করিয়া, নামরূপ রজ্জুদ্বারা মনকে বাঁধিতে যত্নশীল হইবে। মনে রাখিবে, তোমাদের নিজের চেষ্টা যদি থাকে. তবে, আমার গুরুর আশীর্ব্বাদ পাবেই।

তোমরা ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমরা এমন কোন কর্ম্ম করিবে না, যা দ্বারা ঋষিকুলের অসম্মান হয়। সুন্দর, সংযত ও সংহত জীবনই কাম্য জানিবে। আমার আদর, আশিস নাও—রাধেশ্যাম। আশীর্ব্বাদিকা—
মা

২১

সন্ত-আশ্রম, বারাণসী
১৫.২.৭২

নারায়ণেষু,

…বাবার কৃপায় আমার ব্যথা প্রায় সেরে গিয়েছে—আরোগ্যের পথে—তোমরা চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইও না। জীবনে চলার প্রতি পদক্ষেপেই যাতে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারো, তার চেষ্টা করিবে। ৺ভগবানকে পাওয়ার

জন্যে সংসার-আশ্রম ছেড়ে, বনে-জঙ্গলে চলে যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যে যেখানে আছ, তাঁকে সেখানেই পাবে, যদি মন-প্রাণ নিবিষ্ট করে, তাঁকে ডাকৃতে পার। কারণ, তিনি তো সর্ব্বত্র আছেন। এমন কোন স্থান নেই যে তিনি নেই। সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে, সেই তিনিই আছেন বলিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁকে সেবা কর ; তাঁর চেয়ে আপন আর কেউ নেই। তোমার পতিপুত্র, পত্নী-কন্যা, সর্ব্বরূপেই তিনি। সংসারটাকে আমার মনে না করে, তাঁর মনে করিবে—তবেই, সংসার বন্ধনের কারণ না হয়ে, মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাঁকে অর্থাৎ ভগবানকে যে পেতেই হবে—সে কথা সব সময় স্মরণে রাখিয়া পথ চলিও...

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২২

বারাণসী—৯.৩.৭২

নারায়ণেষু—

৺ভগবৎ-কৃপায়, বাবুজীর চোখের অপারেশন ভালভাবেই হয়ে গেছে জেনে, ভাল লাগল।......

মা-সোনা! আমার বাবার কৃপায় তোমাদের উৎসব এখানে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে এবং আনন্দের ভিতর দিয়া মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠান এত সুন্দরভাবে হয়েছে যে, দ্রষ্টার মতন বসে দেখলে মনে হয় যে অলক্ষিতে থেকে বাবা যেন প্রতিটি কাজ পরিচালনা করে গেছেন।...... আমি অপারগ, অযোগ্য বলেই, বাবাকে এখানকার প্রতিটি কাজের ভার নিতে হয়। তোমাদের মিলিত অর্ঘ্য এই বিশেষ যজ্ঞে সর্ব্ব কাজেই সাহায্য করেছে... এই বিশেষ দিনটিতে যারা এসেছে, তারা বাবার আশীর্ব্বাদ পেয়েছেই ; যারা আসতে পারেনি—তাদেরও আমার ৺বাবার আশীর্ব্বাদ জানাই। তোমরা আমার ৺বাবার নাম নিয়ে ৺বাবার দিকে এগিয়ে যাও—এই প্রার্থনা......

তোমাদের শান্তিভাই-এর রচিত 'মাতৃ-ঋতু-রঙ্গ' গীতিনাট্য খুবই সুন্দর ও আনন্দময় হয়েছে। রাধেশ্যাম। আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২৩

বারাণসী—২১.৪.৭২

নারায়ণেষু, নববর্ষ—১৩৭৯

আদরের রেণুকা,

নববর্ষের নব প্রভাতে তোমাদের আমার আদর, আশীষ জানাই। কালের গতিতে একটি একটি করে আবার ৩৬৫ দিন অতিক্রম করে এলাম। এতে কত নূতন ফুল ফুটলো, কত পুরাতন ফুল ঝরে পড়লো—কত ফুল অকালেই শুকিয়ে গেল—রইল জীবনের পাতায় স্মৃতিতে ভরা। এই যে নূতন পুরাতনের খেলা এ ত চিরন্তন, শাশ্বত। কিন্তু, মজা এই যে, আমরা খেলে যাচ্ছি ঠিকই—কিন্তু, খেলার যে মালিক, তাঁর দেখা পাচ্ছি না। আমাদের নূতন বছরে চেষ্টা করতে হবে, যে মালিক-ভৃত্যে যেন দেখা হয়। একমাত্র মালিক-ভৃত্যের দেখা হ'লেই, এ খেলার অবসান হ'য়ে, আমরা শাশ্বত সেই চিরসত্য আনন্দের অধিকারী হব। তোমাদের চেষ্টা আনন্দময়কে পাওয়ার দিকে এগিয়ে যাক্—এই প্রার্থনা। তোমরাও আমার প্রার্থনায় যোগ দিয়ে—ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হও। তোমাদের চেষ্টার পিছনে আমার গুরুজীর আশীর্ব্বাদ থাকবেই।...

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২৪

বারাণসী—১.৫.৭২

নারায়ণেষু,

গুরুজীর কৃপায় তোমরা ভাল থাক, এই চাই। ভাল থাকা অর্থ শুধু—শারীরিক ভাল থাকা নয়। শরীর, মন—দুই-ই যাতে ভাল থাকে—সেদিকে

লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীর ভাল থাকার জন্যে তবুও ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া যায়, কিন্তু, মন ভাল থাকার জন্যে চাই ভগবানের আশীর্ব্বাদ। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়কে, সমানভাবে গ্রহণ করতে না পারলে এই ভাল থাকা যায় না। কামনা-বাসনা ত্যাগ না হলে, প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যদি একজন লোককেও সৎপথে আনতে পার, তবে মহৎ কাজ করলে জানবে। তোমরা যদি মহৎ কাজ কর, তবে, মহানের আশীর্ব্বাদ-লাভ করবেই। বৃথা কাজে, আলস্যে, সময় নষ্ট করিও না।···রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২৫

ওঁ হরি

বারাণসী—১১.৫.৭২

নারায়ণেষু,

সব সময় মনে রাখবে—ভালবাসায় কোন দোষ নেই ; দোষ তখনই হয়, যখন নিজের স্বার্থের জন্যে ভালবাসি। ভালবাসতে চেষ্টা করবে প্রতি অণু-পরমাণুকে। মনে রেখ, ভগবান শুধু মঠে, মন্দিরে, দেবালয়েই, আবদ্ধ নন। তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বজীবে আছেন। তবে, হ্যাঁ, বিশেষ স্থানে তাঁর যে বিশেষ প্রকাশ আছে, তাও মিথ্যা নয়। তোমরা সুন্দর ও নির্ম্মল ফুল হয়ে ফুটে উঠলেই আমার শ্রম সার্থক—আমার আনন্দ, আমার পূর্ণতা! আমার আমিও যে সেই তিনি, তা কিন্তু ভুল না। রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২৬

বারাণসী—১৩.৮.৭২

নারায়ণেষু,

তোমাদের জন্যে চিন্তিত আছি। পত্র দিয়ে জানতে দিও, তোমরা কেমন আছো।

মা সোনা, কল্যাণী থাকাকালীন তোমাদের কাছে পেয়ে—তোমাদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসায় স্নাত হয়ে, আমি অপার আনন্দ পেয়েছি। তোমরা সবাই যে তাঁরই বালবিগ্রহ—তাই, তোমরা আমার এত প্রিয়। তোমরা সুন্দর নির্ম্মল হয়ে, তাঁর দিকে যাও—এই প্রার্থনা।

এখানে এসে তোমাদের 'সন্ত-শিশুবিদ্যালয়' দেখে বড় ভাল লেগেছে—মনে হয় যেন, বাল-গোপাল-গোপালীর উৎসব চলছে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ছেড়ে যত পার আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকতে চেষ্টা কর। রাধেশ্যাম। আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২৭

বারাণসী—২০.৮.৭২

নারায়ণেষু,

৺বাবার কৃপায় তোমরা ভাল থাক—এই ইচ্ছা করি। ইষ্টমন্ত্রই জীবনের পাথেয় জানবে। কলিকালে সব জীব স্বল্পায়ু; কাজেই, লক্ষ্য রাখবে, জীবনের সময় যেন বৃথা না যায়। সময়ের অপচয় জীবনের মস্ত বড় ক্ষতি! জীবনকে করতে হবে ৺ভগবৎমুখী। মনকে করতে হবে নাম-ময়; নাম এভাবে করে যাও, দেহের প্রতি অণু পরমাণু যেন নামময় হয়।...নাম করতে করতে দেখবে—নাম তোমাকে করতে হচ্ছে না—নাম আপনা থেকেই হবে। নামকে প্রিয় থেকে প্রিয়তম কর।...এখানে ঝুলন-উৎসব আরম্ভ হয়েছে। সবাই তাঁর প্রেমতরঙ্গে দোল খেতে চেষ্টা কোরো—চেষ্টার পিছনে আমার ৺গুরুজীর আশীর্ব্বাদ আসবে। আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২৮

ওঁ হরি বারাণসী—২৯.৮.৭২

নারায়ণেষু,

রেণুকা, মা সোনা! অনেক সময় মনে হয় এই যে অখণ্ড আনন্দময়

সত্তারূপে তিনি বিরাজমান, তাঁকে ভুলে কেন আমরা অস্থায়ী অসুন্দর জিনিসের জন্যে মারামারি কাটাকাটি করি ? সাধারণ হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার উর্দ্ধে যে আমাদের উঠতে হবে—তা কিন্তু, কোন রকমেই আমরা না ভুলি। কর্ম্ম আমাদের করতে হবে ; কিন্তু, সে কর্ম্ম যেন আমাদের ভোগ কাটাবার সোপান হয়, কর্ম্ম যেন বন্ধনের কারণ না হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

এই যে গেল পূর্ণিমা—এটাকে রাখী-পূর্ণিমাও বলা হয়—সবাইকে প্রেম-ডোরে বাঁধাই এই কথার অর্থ। আমাদের প্রতিজ্ঞা হউক—মানুষের দোষটুকু সহ-ই তাকে যেন আমরা ভালবাসতে পারি। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সমষ্টি এই জীব-জগৎ। কাজেই দোষ-গুণ তোমার, আমার, সবার মধ্যে আছে জেনে, ভালবাসাকে প্রসার কর। এই জীব-জগতকে ভালবাসা—তাঁকেই ভালবাসা জানবে।

মা-সোনা ! তুমি তোমার মায়ের কথা লিখতে চাও—এত খুবই আনন্দের কথা। তুমি চেষ্টা করে যাও। চেষ্টার পেছনে তাঁর আশীর্ব্বাদ আসবে…

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

২৯

বারাণসী—৫. ৯. ৭২।

নারায়ণেষু,

……আমার গুরুজীর কৃপায় আশ্রমের জন্মাষ্টমী-উৎসব আনন্দের ভিতর দিয়া উদ্‌যাপিত হইয়াছে। জীবনে চলার পথে সব সময় মনে করিবে—আমরা বিষ্ণুর উপাসক ; সর্ব্বভূতে যে তিনি আছেন—তা আমাদের বোধগম্য করিতে হইবে। বিষ্ণু অর্থ সর্ব্ব-ব্যাপকও বোঝায়। বিষ্ণুর উপাসককেই বৈষ্ণব বলা হয়।…প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ—সে বিনয়ী হইবে, অহমিকা নষ্ট করিয়া নিজেকে সকলের দাস ভাবিবে। সর্ব্বজীবে আমার প্রভু, নারায়ণই বিচরণ করিতেছেন জানিয়া, নিষ্ঠাপূর্ব্বক ও প্রেমের সহিত সকলের সেবা করিবে।

যদি তোমার সেবার দ্বারা কেহ প্রসন্ন না হন—তবে ইহা তোমারই ত্রুটি জানিবে। চেষ্টার দ্বারা ত্রুটি সংশোধন করা যায়—হতাশ হইবার কারণ নাই।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৩০

২৪. ৯. ৭২

নারায়ণেষু,

তোমাদের পত্র আমায় কত আনন্দ দেয়! কারণ কি, জান? তোমরা যে আমার বড় আদরের দুলাল-দুলালী। তোমাদের আমি তাঁরই রূপ মনে করি। তিনি যে বিভিন্ন রূপ ধরে, আমাদের কাছে এসেছেন—সেবা করতে, সেবা নিতে। তোমরা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হও—আমি তাঁরই সন্তুষ্টি মনে করি। তোমাদের অসন্তুষ্টিও একারণে তাঁরই অসন্তোষ। আমার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও, তোমরা যে আমায় ভালবাস—তাতো, তাঁরই দয়াময় রূপের প্রকাশ। ইহা সত্য জানবে—তিনি ছাড়া জগতে কেহ নাই—কিছু নাই। ইহা কেবল ভাষা বা ভাব নয়—অতি সত্য কথা—যার চেয়ে বড় সত্যি আর কিছু নেই।······মা-সোনা—তোমার জ্যোতি-দর্শনের কথা জানিয়া ভাল লাগিল। এ সাধনে, এরকম মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার বিশেষ কৃপার নিদর্শন জানিবে। তাঁকে স্মরণে, মননে রাখিতে পারিলে, এমন অনেক জিনিস পাওয়া যায় এবং এর চেয়েও অনেক বড় জিনিস পাবে···

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৩১

বারাণসী—১৭. ৯. ৭২

নারায়ণেষু,

······বাবুজীর অপারেশন হয়ে গেছে ও সে ভাল আছে জেনে সুখী হোলাম······আমার কি মনে হয় জান—আমার যত দোষই থাকুক, তোমরা

সুন্দর ও নির্ম্মল হও। প্রত্যেক মা-বাবাই তার ছেলে-মেয়েদের সুন্দর ও নির্ম্মল দেখ্‌তে চান। আমার মধ্যে কোন গুণ নাই—তবুও আমি মহতের কৃপা পেয়েছি। আমার ৺বাবা অর্থাৎ ৺গুরুজী আছেন—ইহাই আমার সব চেয়ে বড় সম্পদ। পিতৃধনে ছেলে মেয়েদেরই অধিকার। আমি নগন্য হলেও, সেই অধিকারে অধিকারী। পরম্পরারূপে, সৌভাগ্যবশতঃ, তোমরাও সেই সম্পদলাভ করেছ। এখন অলস ভাবে সময় না কাটিয়ে, এই সম্পদকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করতঃ, তাঁর চরণে অর্ঘ্য দেবার চেষ্টা কর। ভোগই জীবন নয়—ত্যাগই জীবন। ত্যাগ করবে—অলসতা, আত্ম-প্রশংসা, পরনিন্দা, ইত্যাদি ; ভোগ করবে—তাঁর নাম-সুধা-স্মরণ-মনন ইত্যাদি। তাঁকে পাওয়া কঠিন নয়—যদি, তাঁর জন্যে সত্যিকার আকুলতা জাগে। তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা করি। মঙ্গলময়ের দিকে এগিয়ে যাবার সাধন কর।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

৩২

বিজয়া-দশমী—বারাণসী

ওঁ হরি। ১১. ১০. ৭২

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুকা-মা-সোনা! ৺বিজয়ার পুণ্যদিনে, তোমাদের আমার ৺বিজয়ার আদর, আশিস্ জানাই।……তোমাদের জীবনে, চলার পথে, আর একটি বৎসর এগিয়ে এলো। ৺বিজয়ার বিজয়-আশীর্বাদ নিয়ে জয়-পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করে, জীবনের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা কর। জীবনে শান্তির পথে অহং প্রবল বাধা দেয়। তোমার 'আমি' তাঁকে দিয়ে—সর্ব্বতোভাবে—তাঁর 'আমি' হবার চেষ্টা কর।

বৎসর, মাস, দিন, পল শুধু এগিয়ে গেলেই তো চলবে না—তাকে সার্থক করতে হবে, তাঁকে পাওয়ার পথ প্রশস্ত করে। কাজেই, আজকের দিনে সবাই

এই শপথ কর—আমরা যেন সত্যিকারের তাঁকে পেয়ে বিজয়ী হ'তে পারি। তাঁকে পাওয়া—তাঁকে জানবার মধ্যেই, জীবনের সার্থকতা জানবে। তোমাদের চেষ্টার পিছনে—আমার দয়াল গুরুর আশীর্ব্বাদ থাকবে। মা-সোনা! আমি তো সারা বছর অনেক কথাই বলে যাই—তোমরা বাণীর মূর্ত্তরূপ দিয়ে তাকে সার্থক করে তোল—এই প্রার্থনা।

মা-সোনা! কেমন আছ—দেওঘর কেমন লাগছে? একবার সবাইকে নিয়ে টুক্ করে চলে আস্‌লে ভারী মজা হয়!

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

৩৩

ওঁ হরি

বারাণসী—৩. ১২. ৭২

নারায়ণেষু,

……গত দু' সপ্তাহ যাবৎ তোমার পত্র না পেয়ে চিন্তিত আছি। তোমরা সবাই ভাল আছ তো? পত্রের মাধ্যমে, আমাদের ভাবের আদান-প্রদান হয়—তাই, পত্র আমাদের কাছে এত আনন্দের। এই ভাবের মাধ্যমে, আমরা যদি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের কাছে না পৌছাই, তবে কিন্তু পত্র, পত্র না হয়ে, বিলাপ হয়ে উঠবে। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি—সবই যেন আমাদের তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন কর্ম্মই বিফল হয় না—যদি, কর্ম্ম তাঁর কর্ম্ম মনে করে, করতে পারা যায়। কাজেই দেখ—কর্ম্মে কোন দোষ নেই—দোষ আমাদের চিন্তাধারার। চিন্তার কেন্দ্র হতে হবে ৺চিন্তামণি। ৺ভগবানকে তোমরা সিকার উপর তুলে রেখোনা। তাঁকে নিয়ে এসো—অণুপরমাণু চিন্তার ভিতর। ৺তিনি যে একান্ত আপন, তাঁর চেয়ে আপন যে আমাদের কেহ নাই—এ কথাটাই বার বার আমি আমার পত্রের মাধ্যমে, তোমাদের মনে করে দিতে চাই। তোমরা একথাটা মনে

রেখে চলো—তবে আমার পত্র লেখা সার্থক হবে। তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা করি। আদর আশিস্ নাও। আশীর্ব্বাদিকা—

মা

৩৪

১. ২. ৭৩—বারাণসী

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুকা মা,

তোমার পত্র পেয়ে খুশী হয়েছি। শ্রীমান বিমলের জন্য খুবই চিন্তিত আছি। সে যখন যেমন থাকে জানতে দিও।······তোমার অবস্থা বুঝতেই পারছি, সব অবস্থায় মনকে শান্ত রাখতে চেষ্টা কোরো। একমাত্র নাম, ধ্যান ও স্মরণেই ভাল থাকা যায়। জীবনে চলার পথে নানারকম সমস্যা আসতেই পারে ; বিশেষকরে, আজকাল মানব জন্মটাই যেন সমস্যা-সঙ্কুল। এই সমস্যাপূর্ণ জীবনে একমাত্র ভগবৎ-নামই পাথেয় জানিবে। মনটা যেন শান্ত, আনন্দময় থাকে—সেদিকে লক্ষ্য রাখ।

তোমাকে কল্যাণীতে কাছে না পেয়ে আমারও খুব খারাপ লেগেছে। তোমার শরীর ভাল আছে তো ? তোমার জন্তেও ভাবনা হয়। আদর, আশিস্ নাও। রাধেশ্যাম

মা

৩৫

ওঁ হরি

১৩. ২. ৭৩—বারাণসী

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুকা মা সোনামনিয়া,

তোমার পত্র পাইয়াছি। এখানে আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি চলিতেছে। কর্ম্ম আমাদের করিতেই হইবে ; তবে, সব সময় মনে রাখিতে হইবে—ভগবৎ-

সেবার নিমিত্ত কর্ম্ম না করিয়া, অন্য অভিপ্রায়ে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মদ্বারা লোক বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। অতএব, আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভগবৎ সেবার্থে, কর্ম্মের আচরণ করিতে হইবে। দেবগণের, গুরুর প্রীত্যর্থে, যে দান, ত্যাগ—তাহারই নাম যজ্ঞ। সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু। তিনি সর্ব্বব্যাপী ; সুতরাং, অন্য সমস্ত দেবতা তাঁহার বিভূতি-মাত্র। বিষ্ণু ও তদ্বিভূতি-স্থানীয় সর্ব্বদেবের, প্রীতির উদ্দেশ্যে মাত্র কৃত না হইয়া, যদি কর্ম্ম অন্য উদ্দেশ্যে কৃত হয়, তবে, ঐ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। তোমাদের বন্ধন মুক্ত করিতেই চেষ্টা করিতে হইবে—ভুলিও না।

যখন যে কথাটা বলিলে অশান্তি হয়, সে কথা না বলাই ভাল। মনের ধৈর্য্য ও শান্তি যাহাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যখনই অশান্ত হইবে, মনে মনে নাম করিবে।…আদর, আশিস্ নাও—রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

৩৬

১০. ৩. ৭৩—বারাণসী

নারায়ণেষু,

৺বাবার কৃপায় তোমাদের উৎসব খুব সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে এবং আনন্দের ভিতর দিয়েই সুসম্পন্ন হয়েছে।……

উৎসবে যারা এসেছেন, তাঁদের পেয়ে যেমন আমার ভাল লেগেছে, তেমনি যারা আসতে পারেনি, তাদের অভাব কিন্তু মনে হয়েছে। প্রতীক্ষায় থাকবো—আবার কখন তোমরা মাতৃকোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। উৎসব মানেই—সকলে মিলে আনন্দ করা। এই আনন্দ হবে নির্দোষ, নির্ম্মল, সুন্দর আনন্দ—আমাদের ভগবানের কাছে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এ কথাটা মনে রেখ।

তোমরা সব সুন্দরের স্পর্শে মনকে আরো সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলতে

চেষ্টা করো। যথাসম্ভব, বাজে কথা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে।

অনেকদিন তোমার পত্রাদি পাই না ; বাবুজী, বিমল কেমন আছে ? তুমিই বা কেমন আছ ? মাঝে মাঝে তোমার পত্র না পেলে যে চিন্তা হয়, তা কি তুমি বোঝ না ! ইতিমধ্যে, তোমার মিষ্টি-'মা' 'মা' লেখাটুকু পেয়েছি।··· তোমরা আমার আদর, আশিস্ নাও—রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

৩৭

২৭. ৩. ৭৩, বারাণসী

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুকা মা ! তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার মা ভাল আছেন।

তোমরা ভাল হয়ে, তাঁর চরণে পুষ্প হবার যোগ্য হও—এই আমি চাই। জীবনে চলার পথে অনেক সুখ-দুঃখ,-মান-অপমান, জয়-পরাজয়, হিংসা-বিদ্বেষ থাকে বা থাকতে পারে ; সবকিছু সমদৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস করবে। অভ্যাসই ক্রমশঃ স্বভাবে দাঁড়াবে। জীবনে ভগবান-প্রাপ্তিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হউক। আর সবকে চলার পথের কণ্টক বলে জানবে। প্রত্যেককে ভালবাসার চেষ্টা কর। কিন্তু, লক্ষ্য রাখবে, কারো প্রতি যেন তোমার মোহ না আসে। জীবকে ভালবাসার অর্থ হোল, বিভিন্নরূপে বিষ্ণুকেই ভাল বাসছ। কারণ, একমাত্র বিষ্ণুই ব্যাপকভাবে, বিস্তৃত হয়ে আছেন। জানবে—জীব রূপেও বিষ্ণু।

মা সোনা ! তুমি ভাল আছ জেনে ভাল লাগল। তোমরা আমার আদর, আশিস্ নাও—রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—

মা

৩৮

৪. ২. ৭৩—বারাণসী

নারায়ণেষু,

আদরের রেণুকা মা!

তোমাদের পত্র পেয়েছি। এখানে এসে প্রচণ্ড শীত পেয়েছিলাম। এখন বাবার কৃপায় শীত কিছুটা কমেছে। শীত কমে, বসন্ত দেখা দিলেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার কারণ কি জান?

বসন্তের সমাগমে গাছে গাছে যেমন মুকুল আসে, তেমনি বসন্ত-সমাগমে, তোমরা সব উৎসবকে উপলক্ষ্য করে এসে, মুকুলে মুকুলে আমাকে ভরিয়ে তুলবে।

তোমরা মুকুল, আমি গাছ—এই তো আমার পরিচয়। তোমরা ফলে ফুলে সুন্দরভাবে ফুটে উঠলেই, আমার গাছ হওয়া সার্থক। এখানে গাছ 'মা', মুকুল হল—সন্তান-সন্ততির দল। সুন্দর ফুল হওয়া যায়—একমাত্র তাঁর নাম, ধ্যান, স্মরণ, মননে। জীবনের সময় বৃথা না কাটিয়ে, সার্থক করে তোলার চেষ্টা কর—এই ইচ্ছা করি।····· রাধেশ্যাম।

আশীর্ব্বাদিকা—
মা

জয় মা—জয় গুরু—জয় মা। জয়, জয়, জয় মা!

ওঁ তৎসৎ—ওঁ তৎসৎ—ওঁতৎসৎ।

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪, ৫, ৭	শিরোনামের প্রথম পংক্তি	মাতৃ-ভক্তির	মাতৃ-শক্তির
৪	১২	তাবে	ভাবে
৪	১৪	জাবনের	জীবনের
১১	২১	স্পন্দিত	স্পন্দিত
১৪	১৫	প্রত্যুষের	প্রত্যুষের
১৯	১, ৪, ৭, ১৫, ১৯, ২৪	ষে/ষা/ষা/ষা/ষে/ষে	যে/যা/যা/যা/যে/যে
২৩	৮, ১২, ১৩	ষে, ষা, ষে	যে, যা, যে
২৫	১	নালমণি	নীলমণি
২৬	৭, ২২	ষা/ষা	যা/যা
২৮	৬	শ্রীশ্রামায়ের	শ্রীশ্রীমায়ের
২৯	২	গেলে	গেল
৩০	১৪	অপুর্ব্ব	অপূর্ব্ব
৩১	১	স্বগায়	স্বর্গীয়
৩২	৭, ২৫	ষে/ষে	যে/যে
৩৪	২৩	আশিষের	আশিসের
৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৫	পৃষ্ঠার উপরে শিরোনামে	গুরুপূর্ণিমা	সিঁথিতে মা
৩৭	২৫	আশীর্ব্বাদে	আশীর্ব্বাদে
৩৯	৭	বেণারস	বেনারস
৪৪	২৪	দর্শন ন	দর্শন না
৫১	১৬	অখণ্ড	অখণ্ড
৯২	২১	খা—াব	খাওয়াব
১০২	৫	বেণারস	বেনারস
১০৪	৫	একত্রিত	একত্র
১১৯	২৫	বিশেষে	বিশেষ

বিষয়-সূচী